ভারতকাহিনী

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

তৃতীয় সংস্ক

কলিকাতা,

৪ নং কলেজ স্কোয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র যন্ত্রে

শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশি

১৩০৩ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাক

বিজ্ঞাপন।

ভারতকাহিনী প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সময়বিশেষে ভারতবর্ষসংক্রান্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৎপ্রণীত "ঐতিহাসিক পাঠ" হইতেও কয়েকটি প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধে গ্রহণ করা গিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধই স্থানবিশেষে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

লর্ড লীটনের প্রবর্ত্তিত মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ভারতসভার অনুরোধে আমি ভারতে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার ইতিহাস বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করি। উপস্থিত গ্রন্থের "ভারতে মুদ্রণস্বাধীনতা" প্রবন্ধে উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকের অধিকাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, ভারতসভা এ বিষয়ে সম্মতি দিয়া, আমায় উপকৃত করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, অনেকগুলি সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র হইতে এই পুস্তকের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন, ভারতের ইতিহাসঘটিত কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, ভারতকাহিনী যদি তাঁহাদের আমোদবর্দ্ধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

কলিকাতা,
১২ই শ্রাবণ, ১২৯০।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে একটি প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। "গুরু গোবিন্দ সিংহ" প্রবন্ধটি পূর্ব্বে মৎপ্রণীত "প্রবন্ধমালা" নামক গ্রন্থে ছিল। ঐ প্রবন্ধ অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উপস্থিত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধও স্থলবিশেষে সংশোধিত হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।



ভারতকাহিনী

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুশীলন।

ভারতবর্ষ এক সময়ে কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ভারতের জ্ঞান, ভারতের গাম্ভীর্য্য, এক দিন পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া ভারতের মহিমা শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। যে দিন আর্য্য মহাপুরুষগণ আপনাদের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য উপদেশরত্নসমূহ সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়; সেই দিন হইতেই ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার জননী হইয়া উঠে। "যে উজ্জয়িনীজনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকশিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী আমোদিত করিতেছে, সেই দিনেই তাহার বীজ ভারতভূমিতে রোপিত হয়; যে প্রভাববতী চিকিৎসাবিদ্যা আজ পর্য্যন্ত রোগার্ত্ত জন-

গণের প্রতীকার বিধান করিয়া আসিতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতে স্থান পরিগ্রহ করে; যে প্রচণ্ড তেজ হলদিঘাট প্রভৃতি রণক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়া ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহার একটি স্ফুলিঙ্গ চিনিয়াবালায় অতুলপরাক্রম শিখ-জাতির হৃদয় হইতে বাহির হইয়া দুর্ব্বার-পরাক্রম ব্রিটিশ তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে," যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসে আদরের ধন হলদিঘাট ও চিনিয়াবালা গ্রীসের ধর্ম্মাপলী ও মারাথন্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতে প্রসারিত হয়। আর্য্যগণ ভারতের নানাস্থানে বসতিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক বুদ্ধিবলে, অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে সভ্যতাবিস্তার করেন। তাঁহাদের নিমিত্ত ভারত সুসভ্য হয়, এবং তাঁহাদের নিমিত্ত ভারতের মহিমা ইতিহাসের বরণীয় হইয়া উঠে।

এখন ভারতের সে মহত্ত্ব বিগত হইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম্ম, সে নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চনদবাহিনী সিন্ধুসরস্বতীর তীরে বসিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ জলদগম্ভীর মধুর স্বরে বেদ গান করিতেন, সে সিন্ধুসরস্বতী আজও পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; যে হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বরে সমাসীন হইয়া, যোগরত আর্য্য তাপসগণ অনন্ত শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, সে গিরিশ্রেষ্ঠ—গিরিগহ্বর আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে; যে হলদিঘাটে আর্য্যতেজ, আর্য্যসাহস বিকশিত হইয়া শত্রুর মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিল, সে হলদিঘাট আজও ভারতের মানচিত্রে শোভা পাইতেছে; যে পশ্চিম শৈলের শিখরে দাঁড়াইয়া অদীনপরাক্রম শিবাজী বিজয়-

ভেরীর গভীর রবে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, সে পশ্চিম শৈল আজও বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের সে জ্ঞান, সে ধর্ম্ম নাই; সে জীবনীশক্তি নাই; সে একতা, সে আত্মত্যাগ নাই। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার স্রষ্টা আর্য্য মহর্ষিগণের বিলাসভূমি গিরিকন্দর অবিকৃত রহিয়াছে; পুণ্যসলিলা সিন্ধুসরস্বতী যথাগতি প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু অদ্য ভারত শ্মশান! ভারতের সে গৌরবসূর্য্য এক্ষণে অতীতকালসাগরে ডুবিয়াছে। সে সাহস, সে বীর্য্য সে রণোন্মাদ সে একতা, সে আত্মত্যাগ এখন কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরবস্থায় পতিত। অদ্যতন ভারতের সন্তানগণ এইরূপ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিঃস্পৃহ! যে ভারত এক সময়ে জগতের শিক্ষাভূমি ছিল, সেই ভারত এখন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত! এইরূপ এক সময়ে ভিক্ষাদাতা, অন্য সময়ে ভিক্ষাপ্রার্থী, এক সময়ে লোকারণ্যের হৃদয়োদ্দীপক কোলাহলপূর্ণ, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির প্রতিরূপ ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার উপায় নাই। ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লোকসমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই; ভারতের ইতিহাসের অভাব দেখিয়া এখন অনেকে ভারতীয় ব্যক্তিদিগকে কুহকিনী কল্পনার কুপোষ্য বলিয়া ধিক্কার দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ভারতের কেহ ইতিহাস লিখিতে জানিত না। ভারতের ইতিহাসের ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ কোন বিষয় কোন সময়ে বিরচিত হয় নাই। সকলেই কেবল কল্পনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিয়া স্বীয় গ্রন্থ অদ্ভুত ঘটনায়

পরিপূর্ণ করিত। যাঁহারা এক সময়ে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে জগতের পূজনীয় ছিলেন, তাঁহারাই এখন অনৈতিহাসিক বলিয়া অপদস্থ হইতেছেন।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কেবল রাজতরঙ্গিণীনামে কাশ্মীর দেশের একখানি ইতিহাস আছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লণ পণ্ডিত এই ইতিহাস আরম্ভ করেন। পরে অপরাপর লেখক কর্ত্তৃক ইহা পরিসমাপ্ত হয়। কাশ্মীরের ইতিহাস—রাজতরঙ্গিণীই সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের অদ্বিতীয় ইতিহাস। তবে কি ভারতবর্ষে ইতিহাসস্থানীয় আর কিছু লিখিত হয় নাই? আর্য্য ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্যজ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে বিকাশ পাইয়া কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা উচিত, কবিতার ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের বিষয় লিখিবার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। এই লিখিত বিষয়গুলি কালক্রমে বিপ্লব পরম্পরায় অথবা কীট ও ঋতুবিশেষের আক্রমণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই মতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে—অকবরের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুয়ল ফজল প্রাচীন ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। এ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, আবুয়ল ফজল কিরূপে স্বপ্রণীত ইতিহাসের বিষয় সংগ্রহ করিলেন? ইহা কি তাঁহার স্বকৃত উদ্ভাবনা? না ইতিহাসস্থানীয় পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়সমূহের সংগ্রহ? যদি আবুয়ল ফজলের ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আবুয়ল ফজল পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের নিকটে স্বীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে আবুয়ল ফজলের ইতিহাস প্রণীত হইত না।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এক জন প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরিব্রাজকের নাম হিউএন্-থ্সঙ্গ ; ধর্ম্ম বৌদ্ধ। পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থদর্শন, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহ এবং পবিত্র সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন প্রভৃতিই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভারতবর্ষে প্রায় পনর বৎসর অতিবাহিত করেন। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজক স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্য বংশীয়দিগের অতীত জ্ঞানের পথ অনেকাংশে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের নিদর্শন দেখিতে পাই। হিউএন্ থ্সঙ্গ লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কেবল দৈনন্দিন ঘটনা লিখিবার ভার সমর্পিত ছিল। এই দৈনিক বিবরণ নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নীলপীঠ যে, ইতিহাসের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউএন্-থ্সঙ্গের বর্ণিত নীলপীঠের বিবরণে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি, ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আর্য্যগণ কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবং সর্ব্বশেষ প্রমাণ, চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাসো।" যিনি দুর্দ্দান্ত মুসলমান আক্রমণকারীর হস্ত হইতে জন্মভূমির রক্ষার

জন্য প্রসন্নসলিলা দৃশদ্বতীর তটে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিচলিত উদারতা ও অবিচলিত দেশহিতৈষিতার জন্য সহৃদয়সমাজে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাই-তেছেন, যাঁহার নিমিত্ত ইতিহাসের আদরের ধন তিরৌরী অতুলপরাক্রম হিন্দুজাতির প্রধান সমরভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, চাঁদ কবি সেই হিন্দুকুলগৌরব, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরায়ের বিবরণ লইয়া "পৃথ্বীরায় রাসো" প্রণয়ন করিয়াছেন। চাঁদ কবির মধ্যে পরিগণিত; তৎপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু চাঁদ কবির গ্রন্থকেও একরূপ ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য যাহাতে ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে তদানীন্তন সময়ের ইতিহাসের অংশ বলা গিয়া থাকে। সুতরাং চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাসো" কাব্য হইলেও যে, অসম্পূর্ণ ইতিহাস, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই "পৃথ্বীরায় রাসো" এবং পূর্ব্বকথিত আবুয়ল ফজলের ইতিহাস ও নীলপীঠের বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার নিয়ম ছিল।

ইতিহাসস্থানীয় বিষয়গুলি লিখিবার ভার রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর উপর ছিল, এবং উহা রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় কাগজপত্রের মধ্যে থাকিত। সময়ের পরিবর্ত্তনে এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে, এক আক্রমণের পর অন্য আক্রমণে সমুদয় বিষয় পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ রাজ্যবিপ্লবে ও বিদেশী জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত উক্ত লিখিত ঘটনাবলীও বিনষ্ট হইয়াছে।

যদি কেহ এই যুক্তিতে অনাস্থা দেখান, তাহা হইলেও তাদৃশ ক্ষোভ নাই। কারণ, যে ইয়ুরোপ এক্ষণে আপনাকে সভ্যতাভিমানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত করিতেছে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সেই ইউরোপে ইতিহাসের অবস্থা কিরূপ ছিল? যাহা প্রকৃত ইতিহাসপদে বাচ্য, তাহা কেবল গত শতাব্দী হইতে ইয়ুরোপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সংঘাতেই ইয়ুরোপীয়দিগের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ হয়। এই উৎকর্ষ হইতে ইয়ুরোপে প্রকৃত ইতিহাসের উৎপত্তি। যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী ইয়ুরোপে ইতিহাস বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়িত, তখন বহু প্রাচীন আর্য্যগণের তদ্বিষয়ক অনভিজ্ঞতা বড় অপমানের কথা নহে।

আর্য্যগণ ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, এখন তদ্বিষয়ের অনুশীলন অপেক্ষা আমাদের স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলনই অধিকতর আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ স্বদেশের জন্য নির্জ্জন প্রদেশে নীরবে বসিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া থাকেন; যদি কেহ অত্যাচারপীড়িত জন্মভূমির সুখশান্তি বাড়াইতে যত্নশীল হয়েন, যদি কেহ মহাকবির রসময়ী লেখনী-বিনিঃসৃত "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া স্বদেশের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সকলের আগে তাঁহার স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করা উচিত। স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না। বেদনার কারণ না বুঝিলে ঔষধপ্রয়োগ ব্যর্থ হইবে। স্বদেশের অতীতবিষয়ক জ্ঞানের সহিত বর্ত্তমানবিষয়ক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই

শোকসন্তাপ দূর করিবার উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশের ইতিহাস পাঠের অন্যরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির উপর স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশের হিতকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে ব্রিটিশ রাজনীতির সহিত পরিচিত হওয়া বিধেয়। মনোযোগের সহিত স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে ব্রিটিশ রাজনীতির কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য নহে। ইংরেজ চিত্রকরের হস্তে ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র কোথাও অতিরঞ্জিত, কোথাও বা অস্ফুট হইয়াছে। অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত চিত্র দ্বারা যেরূপ আলেখ্যের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ অতিবর্ণিত বা অবর্ণিত ইতিহাস পড়িলে ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না। ইংরেজ ঐতিহাসিকের হস্তে ভারতের যে যে ঘটনা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এই স্থলে তৎসমুদয়ের কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

মরে, সুয়েল প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ সিরাজউদ্দৌলাকে অন্ধকূপহত্যার প্রধান অধিনায়ক বলেন। সিরাজউদ্দৌলা শত অপরাধে অপরাধী হউন; জনসমাজে প্রজাপীড়ক, প্রজাঘাতক বলিয়া ধিক্কৃত হউন; ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীর আঘাতে তাঁহার চরিত্রপট ক্ষতবিক্ষত হউক; কিন্তু সিরাজ অন্ধকূপ হত্যার

পাপে পাপী নহেন। ন্যায়ের পক্ষপাতবর্জ্জিত বিচার এই আরোপিত অপরাধ হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিবে।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পতন হয়। দুর্গ অধিকৃত হইলে হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬ জন ইংরেজ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সিরাজউদ্দৌলার সমক্ষে আনীত হন। সিরাজ, হলওয়েল্ প্রভৃতিকে শৃঙ্খলবিমুক্ত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। রাত্রিতে নবাব বিশ্রামভবনে গমন করিলে তাঁহার এক জন সেনাপতি ইংরেজ বন্দীদিগকে একটি ক্ষুদ্রায়তন গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। যাঁহারা অন্ধকূপ-হত্যার ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা কারারুদ্ধ ব্রিটিশ বন্দীদিগের দুরবস্থা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রচণ্ড নিদাঘের রাত্রিতে স্বল্পপরিসর নির্ব্বাত গৃহে ১৪৬ জন মনুষ্যের একত্র অবস্থান কি ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!

রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণসহচরী ঊষা ধীরে ধীরে জগৎ উদ্ভাসিত করিল। নবাবের সেনাপতি কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। তখন কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! স্তূপীভূত ১২৩ জন মৃত দেহের মধ্য হইতে ২৩ জন বিবর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট জীবিত শরীর বাহিরে আসিল। নবাব এই সাংঘাতিক ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। তিনি সেনাপতিদিগের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া বিশ্রাম-ভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সুতরাং দোষভার বন্দীরক্ষক সেনাপতির স্কন্ধেই অর্পিত হইতেছে। এরূপ স্থলে সিরাজউদ্দৌলাকে দোষী করা সঙ্গত নহে। তবে সিরাজ অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন নাই। এ অংশে অবশ্য তাঁহার ত্রুটি লক্ষিত

হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলা সর্ব্বদা তোষামোদপ্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। এইরূপ চাটুকারগণের সংসর্গে থাকাতে তিনি কিয়দংশে অব্যবস্থিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয়, এই অব্যবস্থিততা প্রযুক্ত তিনি অপরাধীকে দণ্ড দেন নাই।

দ্বিতীয় ঘটনা; দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকার। ইংরেজ লেখকগণের অনেকে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। অনেকে কেবল মুলতানের শাসনকর্ত্তা মুলরাজের অভ্যুত্থানকেই উহার প্রধান হেতু বলিয়া নীরব হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটি ধরিতে হয়,—১ম, মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষী মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন; ২য়, দলীপ সিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অসম্মতি, এবং ৩য়, হাজরার শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার ছত্রসিংহের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণ হইতেই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের উৎপত্তি। শিখযুদ্ধের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ প্রবলপরাক্রম শিখ জাতির অন্যায় আচরণের ফল এবং পঞ্জাব অধিকার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করা অনুচিত।

তৃতীয় ঘটনা; অযোধ্যা অধিকার। অন্ধকূপ হত্যা ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের ন্যায় এই বিষয়ও অধিকাংশ ইংরেজ লেখকের লেখনীর অযথা পরিচালনায় বিকৃত হইয়া ভারতের ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। এই লেখকদিগের মতে অযোধ্যায় বড় অত্যাচার ও অবিচার হইত। লর্ড ডালহৌসী এজন্য নবাব ওয়াজিদ

আলীকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশপ হিবর, হারমান্‌মেরিবেল প্রভৃতি সহৃদয় ইংরেজ স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, অযোধ্যায় এরূপ কোন দৌরাত্ম্য হয় নাই, যে জন্য উক্ত রাজ্য গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। বরং ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্য অপেক্ষা অযোধ্যা সুশাসিত ছিল।

সকল ইংরেজ লেখকই যে, ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক লেখক পক্ষপাতশূন্য হইয়া এ বিষয়ে ন্যায়ানুমোদিত পথ অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতবর্ষ এই মহাপুরুষদিগের নিকটে চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

যাহা হউক. সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও প্রমাদরহিত স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করা স্বদেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে স্বদেশের প্রতি গভীর হিতৈষণার উৎপত্তি ও গভীর সহৃদয়তার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাল্মীকি, ব্যাসের ন্যায় কবি; পাণিনি, পতঞ্জলির ন্যায় বৈয়াকরণ এবং গৌতম, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকের নাম মনে হইলে কোন্ সহৃদয় ভারতবাসীর হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ না হয়? কে এই মহাপুরুষদিগের বিবরণ পাঠে সমুদ্যত না হয়? প্রাচীন আর্য্যগণ এক সময়ে জগতের পূজনীয় ছিলেন। তাঁহারা কোমল বিষয়ের কোমল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগেই ব্যাসক্ত থাকিতেন না। তাঁহারা কেবল ভ্রমরচুম্বিত প্রভাতকমলের অঙ্গবিলাস দেখিয়া অথবা কাব্য নাটকের অনুশীলন করিয়াই কালাতিপাত করিতেন না। তাঁহারা গভীর বিষয়ের গভীর চিন্তায় সংযত থাকিতেন। তাঁহাদিগের হৃদয় সুখে

দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, অভ্রভেদী গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিত। তাঁহারা সাহিত্যবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, সমর-কৌশলে অদ্বিতীয় এবং ধর্ম্মনীতিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এক সময়ে ভারতবর্ষ সাহস ও তেজস্বিতার সহিত এইরূপ জ্ঞানের মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

আর্য্যগণ দশগুণোত্তর সংখ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা। আর্য্যগণ ক্ষেত্রতত্ত্ব, ত্রিকোণমিত, বীজগণিতের উৎকর্ষকারক। আর্য্যগণ প্রভাববতী চিকিৎসাবিদ্যার প্রধান অনুশীলনকারী। আরব ও গ্রীশদেশীয়গণ আর্য্যদিগের নিকটে গণিতাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন। যে গ্রীশ হইতে ইয়ুরোপের এত শ্রীবৃদ্ধি, সেই গ্রীশই প্রাচীন ভারতের মন্ত্রশিষ্য।

আর্য্যগণ গণিতাদি শাস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী। এক সময়ে হিন্দুদিগের সমরকৌশলে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, সামরিক কৌশল প্রভৃতিতে আর্য্যগণ যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মনীতিতেও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাক্য সিংহের ধর্ম্মভাব আজ পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। রাজ্যেশ্বরের স্নেহাস্পদ পুত্র ও আজন্ম সৌভাগ্যসম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়াও শাক্যসিংহ কেবল ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্ব্বপ্রকার বিষয়নিবৃত্তি তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। তিনি "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা, ও চক্র-নেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা জানিয়া, সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জন গিরিকন্দরে বা নির্জ্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া গভীর তপস্যায় নিবিষ্ট ছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাব জগতে অতুল্য ও

অমূল্য। শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্ম এক্ষণে মধ্যএশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক চীনে প্রসারিত হইয়াছে। হিমগিরির শৃঙ্গ অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে। সংক্ষেপে—কামস্কটকার তুষারক্ষেত্র হইতে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মপ্রচারক শাক্যসিংহ ভারতের স্নেহাস্পদ সন্তান।

প্রাচীন আর্য্যদিগের গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহাতেও আর্য্যগণের ধর্ম্মভাব দেদীপ্যমান দেখিবে। রামায়ণ ও মহাভারতের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির ধর্ম্মভাবের জন্য আজ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অধিক কি, আর্য্যগণের ধর্ম্মনীতি বিদেশীয়দিগকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিয়ান এবং বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউএন্ থ্সঙ্গ্ উভয়েই মুক্তকণ্ঠে হিন্দুদিগকে সত্যবাদী,উদারস্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতভূমি এইরূপ বিদ্যা, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মনীতির বিকাশক্ষেত্র ছিল।

আইস, আমরা একবার সেই মনস্বী আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের চরণে প্রণাম করি; আইস, একবার সেই পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মনীতির অলোচনা করিয়া উদারতা ও সরলতা সংগ্রহে যত্নশীল হই; যত দিন পবিত্র আর্য্যশোণিতের শেষ বিন্দু আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, আইস, তত দিন আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় জীবনের শান্তিময় উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকি।*

* কলিকাতার যুবজনসম্মিলনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুশীলন" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে লিখিত।

ভারতে আর্য্যবসতি।

আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথম পঞ্চসরিৎবিধৌত বিস্তৃত জনপদের অধিবাসী ছিলেন। ক্রমে বংশবৃদ্ধির সহিত তাহাদের বসতিস্থানের সীমাবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অনার্য্য লোকের বাস ছিল। আর্য্যেরা যখন ইহাদের অধ্যুষিত জনপদে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন ইহারা সহজে আপনাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিল না। ইহাদের সাহস, ইহাদের শক্তি এবং গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি ইহাদের অনুরাগ ইহাদিগকে আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিল। আর্য্যদিগের এই প্রতিদ্বন্দ্বিগণ বেদে দস্যু অথবা দাস নামে উক্ত হইয়াছে।

আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। আর্য্যগণ সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উৎকৃষ্ট প্রণালীর অবধারণ করিতে পারিতেন; দস্যুগণ এরূপ এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে জানিত না। আর্য্যদিগের মধ্যে সমাজতন্ত্র ছিল; সকলে উৎকৃষ্টতর সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিতেন; দস্যুগণের মধ্যে এরূপ সমাজতন্ত্র ছিল না; সমাজের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাও প্রণীত হইত না। আর্য্যগণ যুদ্ধের নিয়ম জানিতেন, উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। দস্যুগণ সামরিক রীতি কিছুই জানিত না; তাহাদের উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কোন বিষয়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলে আর্য্যগণ আপনাদের বুদ্ধিবলে কৃতকার্য্য হইবার প্রশস্ত উপায় অবধারণ করিতেন, এবং

অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন ; দস্যুদিগের এরূপ বুদ্ধিবল ছিল না, সুতরাং তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। আর্য্যগণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দেবতাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়শ্রী অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন ; দস্যুদিগের এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠা ছিল না, তাহারা কেবল আপনাদের বাহুবলেরই গৌরব করিত। আর্য্যগণ সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সমিতিতে সকলে একত্র হইতেন ; এই সমিতিতে সাহসী ও প্রতিভাশালী, সুযোদ্ধা ও সুকবিগণ সাধারণের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইতেন ; দস্যুদিগের এরূপ সমিতি সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। আর্য্যগণ অরাতিদিগকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতেন, সম্মুখযুদ্ধ ব্যতীত ইঁহারা আর কোনরূপে শত্রুর অনিষ্ট করিতেন না ; দস্যুগণ সকল সময়ে সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইত না ; তাহারা অনেক সময়ে লুকাইয়া থাকিয়া, সুযোগক্রমে শত্রুপক্ষের খাদ্যসামগ্রী বা সম্পত্তি হরণ করিয়া, বিঘ্ন জন্মাইত। আর্য্যগণ সুগঠিত, সুশ্রী, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দস্যুগণ খর্ব্বকায়, কদাকার ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল। সংক্ষেপে, সভ্যতার অনতিস্ফুট আলোক আর্য্যদিগকে ক্রমে উদ্ভাসিত করিতেছিল, অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার দস্যুদিগকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

দস্যুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। লৌহ অস্ত্র ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখানি ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দস্যু অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল।

ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অনুচর থাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময়ে আর্য্যগণ আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকটে শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করিতেন।

আর্য্যগণ সিন্ধু প্রভৃতি যে যে দেশে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দেশেই দস্যুগণ তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। ইহারা অভিনব আক্রমণকারীদের নিকটে সহজে মস্তক অবনত করিল না। সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আর্য্যেরা এই অসভ্যদিগের সাহস ও স্বদেশ-ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের অধ্যুষিত স্থান নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিত পরাঙ্‌মুখ হইলেন না। তাঁহাদের সৈনিকগণ প্রধানতঃ পদাতি ও অশ্বারোহী, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যে অনেকগুলি দল সংগঠিত হইল। প্রতি দলের এক এক জন সেনাপতি নিয়োজিত হইলেন। ইহারা যুদ্ধরথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সমরদেবতার স্তুতিগীতি গাইতে গাইতে আপন আপন সৈন্য চালনা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন পতাকা সকল ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে শোভা পাইতে লাগিল। সৈন্যগণের কেহ ধনু ও তীর, কেহ বড়শা বা তরবারি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ আপনাদের সৈনিকদল সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ ইহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা আপনাদের শস্যপূর্ণ গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে তরবারির মুখে সমর্পিত হইল। অনেকে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক নানাবিধ উপহার দিয়া বিজেতাদিগকে পরিতোষিত করিল।

দস্যুদিগের যে সকল জনপদ অধিকৃত হইল, আর্য্যগণ তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে অসভ্য দস্যুজনপদে আর্য্যদিগের রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত হইল এবং আর্য্যদেবগণ স্তুত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপনাদের অধিকৃত রাজ্যের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হইয়া যায় নাই। এক দিনে সমগ্র দস্যুজনপদ আর্য্যদিগের অধিকৃত হয় নাই। এই যুদ্ধ বহু বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, বহু বৎসর ব্যাপিয়া ভারতের এই অসভ্য জাতি, প্রবল-পরাক্রান্ত, সহায়সম্পন্ন আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। শেষে যখন ইহাদের জয়লাভের আশা নির্ম্মূল হইল, তখনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না; কেহ আত্মীয়গণের সহিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল; কেহ বা বিজন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। আর্য্যদিগের ইতিহাসের কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পরাজিত হয় নাই। এখন ভারতবর্ষে খস, গারো, পুলিন্দ, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়, অনেকের মতে সেই সকল জাতির লোক আদিম দস্যুদিগের সন্তান। এই দস্যুসন্তানগণ সাহসী, যুদ্ধকুশল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা সদ্ব্যবহারকারীর সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া থাকে। লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ ইহাদের সাহস এবং ইহাদের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়াই, দক্ষিণাপথের যুদ্ধে জয়ী হয়েন, এবং পলাসীর রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদানত করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আর্য্যগণ পঞ্জাবে বাস করিতেন।

কিন্তু সর্ব্বপ্রথম একবারে সমগ্র পঞ্জাব বা উহার বহিঃস্থ ভূভাগ তাঁহাদের বসতিস্থানের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। আর্য্য সেনাপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দস্যুজনপদের অধিকারী হইলেও প্রথমে উত্তর ভারতের একটি বিশেষ ভূখণ্ডে বাস করিতেন। এই ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে পরিচিত। ইহা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সরস্বতী বিনশননামক স্থানে বালুকাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। দৃষদ্বতী বর্ত্তমান সময়ে কাগার নাম ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল এবং বিস্তার ২০ হইতে ৪০ মাইল।

আর্য্যদিগের বংশ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ব্রহ্মাবর্ত্তে যখন তাঁহাদের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর তাঁহারা যে জনপদে গিয়া বাস করেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষি। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত। এই প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত; কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন। কুরুক্ষেত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের নিকটে অবস্থিত। মৎস্যদেশ কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে। দিনাজপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া মৎস্যদেশ; কেহ কেহ কহেন, জয়পুররাজ্যের কোন কোন অংশ মৎস্যদেশের অন্তর্গত ছিল। পঞ্চালের বর্ত্তমান নাম কান্যকুব্জ বা কনৌজ; শূরসেন বর্ত্তমান মথুরা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বংশবৃদ্ধির সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তৃত হয়।

ব্রহ্মর্ষির পর আর্য্যগণ যে স্থানে যাইয়া বাস করেন, তাহার

নাম মধ্যদেশ। মনুসংহিতার মতানুসারে মধ্যদেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যদেশের পর আবার উপনিবেশের সীমাবৃদ্ধি হইল। আর্য্যদিগের বংশ যখন এত বাড়িয়া উঠিল যে, মধ্যদেশেও সকলের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা আপনাদের আবাসের জন্য চতুর্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই চতুর্থ স্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা কালকবন বা বর্ত্তমান রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ সীমা পারিযাত্র বা বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং পশ্চিম সীমা আদর্শাবলী বা আরাবলী পর্ব্বত। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্প্রসারিত হয়। মনুসংহিতার মতে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে পূর্ব্বসাগর, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং পশ্চিমে পশ্চিমসাগর।

আর্য্যগণ যে, কেবল এই চারি স্থানেই আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ক্রমে দক্ষিণাপথেও তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। এই সকল উপনিবেশস্থাপন ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল। আর্য্যদিগের বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আবাস-স্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে বসতি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। আর্য্যগণ এক সময়েই সমুদয় স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন নাই।

আর্য্যগণ যখন দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন ভারতবর্ষে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আর্য্যপ্রধানগণ দরবারে উপস্থিত

হইয়া যথানিয়মে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে ইঁহারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, আর্য্য গোষ্ঠীপতি, আর্য্য যাজ্ঞিক এবং আর্য্য সেনাপতি। সমাজে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই আদর ও মর্য্যাদা ছিল। রাজাদের অন্তঃপুর ছিল। তাঁহারা সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। মৃগয়ায় তাঁহাদের আসক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা সুবিস্তৃত আরণ্য প্রদেশে যাইয়া পশুহননে প্রবৃত্ত হইতেন। আরাধ্য দেবতার পূজায় এবং পুরোহিতদিগকে ধনদানে তাঁহাদের ঔদাসীন্য ছিল না। সামন্তগণ তাঁহাদের সহচর ছিল। তাঁহারা এই সমস্ত সহচরে পরিবৃত হইয়া চারণদিগের মুখে প্রশংসাগীতি শুনিতে শুনিতে আপনাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা দেখাইতেন।

এই সময়ে আর্য্য-সমাজের সাধারণ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীপতি পরিষ্কৃত ও সুন্দর গৃহে বাস করিতেন। তিনি রূপলাবণ্যবতী কামিনীদিগকে যথানিয়মে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক অনুচর ও গৃহপালিত পশু থাকিত। দেবসেবার উপলক্ষে তিনি ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, সমাজে প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। অগ্রে তিনি ভোজনস্থানে উপবিষ্ট না হইলে কেহই ভোজনে প্রবৃত্ত হইত না। তিনি সর্ব্বদা অনুচরবর্গের সহিত আত্মপ্রাধান্য ও সমাজে আত্মক্ষমতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বিমুখ হইতেন না। তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধবেশে থাকিতেন। সুকঠিন বর্ম্ম তাঁহার দেহ রক্ষা করিত, এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি ও শাণিত বড়শা

তাঁহার হস্তে শোভা পাইত। তিনি গলদেশে হার ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিতেন। কিরূপে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় বীরত্ব দেখান যায়, ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় ছিল। প্রকৃত যুদ্ধবীর হওয়া তিনি ধর্ম্মসম্মত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিতেন। আরাধ্য দেবতার নিকটে স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক আবাসগৃহ, এই তিনটি তাঁহার প্রার্থনার বিষয় ছিল। তিনি যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিতেন। যুদ্ধে বা ভোগবিলাসের দ্রব্য-সংগ্রহে তাঁহার সন্তানগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহায়তা করিত। এজন্য তিনি দেবতাদের নিকটে সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান প্রার্থনা করিতেন। পরিবারপ্রতিপালন ব্যতীত অধিকৃত জনপদের শান্তিরক্ষণ কার্য্যেও তাঁহার মনোযোগ ছিল। তিনি একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতেন। তদীয় ধর্ম্মপত্নীগণ উপাসনাস্থলে বা উৎসবভূমিতে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরোহিতেরা তাঁহার দানশীল-তার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। প্রাত্যহিক উপাসনাকার্য্যে পুরোহিতগণ তাঁহার সহায়তা করিতেন।

মহিলাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহাদের বেশভুষার ক্রমে পারিপাট্য হইয়াছিল। তাঁহার যখন স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারিতেন, তখন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই-তেন। কে কেহ বা চিরকুমারী হইয়া থাকিতেন। যুদ্ধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অশ্ব ও হস্তী, উভয়কেই যত্নসহ-কারে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিল্পীরা নানাবিধ বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করিত। প্রধান প্রধান লোকে এই সকল দ্রব্য কিনিয়া লইতেন। শ্রমজীবীরা যথানিয়মে আপনাদের পরিশ্রমের মূল্য পাইত। সাহস করিয়া কেহ কোন মহৎ কার্য্যসাধনে অগ্র-

সর হইলে সকলেই তাহাকে উৎসাহিত করিত। এইরূপে আর্য্যদিগের সাহস ও পরাক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইত, ক্রমেই তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইতেন।

আর্য্যসমাজে পুরোহিতের সবিশেষ আদর ও মর্য্যাদা ছিল। রাজা ও গোষ্ঠীপতিগণ, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন, সকলেই তাঁহার অভিলাষপূরণে চেষ্টা পাইতেন, এবং সকলেই উপসনাসময়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। পুরোহিত সর্ব্বদা রাজ-দরবারে যাইতেন; রাজার অন্তঃপুরেও তাঁহার গমন নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু তিনি শাসনসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ক্ষমতা কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়েই আবদ্ধ থাকিত। সুতরাং শাসনকর্ত্তা বা সেনাপতিদিগের ন্যায় তিনি আপনার আধিপত্য দেখাইতে পারিতেন না। এরূপ হইলেও পুরোহিতের পদগৌরব কোন অংশে হীন ছিল না। তাঁহার অনেক অনুচর থাকিত। তিনি রাজার নিকট গাভী, রথ, অশ্ব, বহুমূল্য গাত্রবস্ত্র ও বহুসংখ্য দাস পাইতেন। সুতরাং পুরোহিত পরমসুখে কালাতিপাত করিতেন। গোষ্ঠীপতিগণ অনেক বিষয়েই পুরোহিতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। পুরোহিত উপস্থিত না হইলে প্রভাতে ও সায়ংকালে দেবতার আরাধনা বা পবিত্র অগ্নিকে উপহার দেওয়া হইত না। পুরোহিত যথানিয়মে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে সমিতি হইত। এই সমিতিতে সকলে সমবেত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনা করিতেন। যে সকল ছাত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়

শিক্ষা করিত, তাহাদের পরীক্ষা লইয়া, উপযুক্ত ছাত্রদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইত। উপাধিদানের রীতি আড়ম্বর-শূন্য ও সরল ছিল। সমিতিস্থ বৃদ্ধ পুরোহিত ও শিক্ষকগণ সম্মত হইলে শিক্ষার্থিগণ প্রশংসাপত্র পাইত। যে ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইত, তাহাকে হলচালনা করিতে হইত। সমাজে পুরোহিতের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহারা পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্ব্বক যে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাহা লোকে কেবল পার্থিব সুখের দ্বার বলিয়া বিবেচনা করিত না; দেবগণকে সন্তোষিত করিবারও একমাত্র উপায় মনে করিত। সুতরাং সাধারণে দেবগণের প্রীতিসাধন জন্য ও সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ পাইবার আশায় পুরোহিতগণের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া থাকিত। পুরোহিতগণ ক্রমে সমাজে আপনাদিগকে অসীমশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

রাজা ও পুরোহিতের পর জনসাধারণ আর্যসমাজের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিত। এসময়ে কৃষিকার্য্য সকলেরই অভ্যস্ত ছিল। পুরোহিত আপনার কার্য্যে অপারগ হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। সেনাপতি যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইলে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। গোষ্ঠীপতি সমাজের শাসনকার্য্য হইতে অবসর লইলে কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইতেন। ভূমি চাষ করা সকলেই একটি পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিত। কেহই এই পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যে উদাসীন হইত না। যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তখন সকলে আপনাদের গোরু ও লাঙ্গল কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে করিয়া অরাতিনিপাতে বহির্গত

হইত। যাহা হউক, কৃষিকার্য্যের এইরূপ আদর থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য ব্যবসায় অপ্রচলিত ছিল না। বণিকেরা স্থলপথে বা জলপথে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া যাইত। দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি ছিল। শিল্পজীবিগণ স্বর্ণের নানাবিধ আভরণ, লৌহের নানাবিধ অস্ত্র ও কৃষি কার্য্যের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। সাধারণতঃ পশম ও কার্পাসবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। শিল্পিগণ ভোগবিলাসরত মহিলাদের জন্য পারিপাট্যশালী বস্ত্র প্রস্তুত করিত। তুষারধবল বস্ত্রেরই মূল্য অধিক ছিল। সূচীকার্য্যের আদর ছিল। অনেকে দরজীর কাজ করিত। জনসাধারণের মধ্যে চুক্তিসংক্রান্ত আইন অপ্রচলিত ছিল না। সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়ার প্রথা ছিল। কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত হারে সুদ গৃহীত হইত। কৃষিক্ষেত্রে প্রচুরপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত; এ দিকে শিল্পজাত দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত। সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহের কোন কষ্ট ছিল না। এই সময়ে কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্রসমূহে যথাসময়ে জলসেচন জন্য, স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইত। আর্য্যগণ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন; প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর শুচি হইয়া পবিত্র অগ্নি প্রজ্বালিত করিতেন, এবং ভক্তিরসার্দ্রহৃদয়ে নানাবিধ উপহার দিয়া সেই অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। জনসাধারণ উষার উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র গান করিত, তৎসমুদয়ে তাহাদের কার্য্যতৎপরতা পরিস্ফুট হইত। উষার স্তুতির পর সাহসী যোদ্ধারা বিপক্ষের ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইত; কেহ কেহ শান্তভাবে গোধন সঙ্গে

কৃষিক্ষেত্রে যাইত, কেহ বা আপনাদের অবলম্বিত ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিত।

এই সময়ে আর্য্যমহিলাগণের অবস্থা নিকৃষ্ট ছিল না। ইহারা যথানিয়মে শিক্ষা পাইতেন, দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারিণী ছিলেন, এবং স্বামীর সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বিশ্ববারানামে একটি মহিলা ঋগ্বেদের কয়েকটি স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আর্য্যমহিলাদিগের সুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মহিলাগণ সর্ব্বদা সংযতভাবে থাকিতেন। নিরবচ্ছিন্ন বিষয়ভোগে তাঁহাদের আসক্তি ছিল না। চিরকুমারীরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। কুলকামিনীগণের যথোচিত সম্মান ও সমাদর ছিল। ইহারা উপস্থিত হইলে পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়া, ইহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। গর্ভবতী রমণী ও বালক বালিকাদের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। ধর্ম্মপরিণীতা স্ত্রী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত না হইলে গৃহস্থের যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইত না। ইহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ থাকিতেন না। উপাসনাস্থলে বা উৎসবভূমিতে স্বামীর সহিত ইহাদের আগমন প্রতিষিদ্ধ ছিল না। স্বামীকর্ত্তৃক নিষিদ্ধা না হইলে ইহারা অপর লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন। স্বামী বিদেশে থাকিলে, ইহারা অপরের বাটীতে যাইতেন না, এবং উৎসবস্থলে বা প্রকাশ্য সমিতিতে উপস্থিত হইতেন না। এই সময়ে ইহারা ঘরে বসিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন। মহিলাগণ কঞ্চুলিক (কাঁচুলী) পরিধান করিতেন, এবং নম্রতা রক্ষার জন্য চাদরে মস্তক আবৃত রাখিতেন। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাগণ কাঁচুলীর উপর আঙ্গিয়া (কোর্ত্তা) ধারণ করিতেন

পুরসীমন্তিনীগণ স্বর্ণাভরণ ধারণ করিতেন। তাঁহাদের কেশগুচ্ছ খোঁপার ন্যায় মস্তকের দক্ষিণ ভাগে থাকিত। স্বর্ণময় শিরোভূষণ এই কেশগুচ্ছের উপর শোভা পাইত। সাংসারিক কার্য্যভার গৃহিণীদিগের উপর সমর্পিত ছিল।

বৈষয়িক কার্য্যের তারতম্য অনুসারে আর্য্যসম্প্রদায় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তিন শ্রেণীর লোকেই আপনাদের অবস্থামত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। এই সময়ে কোন কোন গৃহ দ্বিতল ছিল। গৃহের বাহ্য সৌন্দর্য্যের তাদৃশ আড়ম্বর ছিল না। মাটীর দেয়াল দিয়া গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। কিন্তু গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ছিল। কোন গৃহই অপরিষ্কার থাকিত না, কোন গৃহই স্বাস্থ্যের হানি করিত না, এবং কোন গৃহই বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখা যাইত না। গৃহে যাইবার পথ পরিষ্কার থাকিত। পথের পার্শ্বে রমণীয় পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইত। বিশ্বস্ত কুকুর গৃহদ্বার রক্ষা করিত। গৃহের মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে দেবারাধনা ও যজ্ঞের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। এইখানে পবিত্র অগ্নি থাকিত। এই উপাসনাভূমির প্রতি আর্য্যগণের সবিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। ইহা কোন প্রকারে অপবিত্র হইলে সকলে আপনাদিগকে প্রনষ্টসর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহা সর্ব্বদা রক্ষিত হইত। এই যজ্ঞভূমি দর্শনে আর্য্যদিগের হৃদয়ে অভিনব আশা ও উৎসাহের উদয় হইত। অভিনব আশা ও উৎসাহের সহিত আর্য্যগণ এই যজ্ঞভূমিতে সমবেত হইতেন। প্রাতঃকালে ও সায়ন্তন সময়ে গৃহস্বামী স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত হইয়া পুরোহিতের সাহায্যে পবিত্র অগ্নিতে আহুতি দিতেন। ছোট

ছোট বালকবালিকারা সমস্বরে পবিত্র স্তোত্র গান করিত। এখন আমাদের মধ্যে কৌষেয় বস্ত্র যেমন পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, আর্য্যদিগের মধ্যে তেমনি শ্বেত পরিচ্ছদের পবিত্রতা ছিল। পুরোহিত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; গৃহস্বামী শ্বেত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উপাসনাভূমিতে উপস্থিত হইতেন।

দুর্গ সমূহ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকিত। এই সময়ে কৃষিক্ষেত্র, গোচারণস্থান, ও গাভী আর্য্যদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। আর্য্যগণ গাভীদিগকে যত্নসহকারে রক্ষা করিতেন। গোদোহন একটি পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গোষ্ঠীপতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। গাভীদিগকে পরিস্কৃত স্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা হইত। আর্য্যগণ সংযতচিত্তে প্রত্যেক গাভীকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণ করিতেন। ইহার পর বৎসের দুগ্ধ পান শেষ হইলে পর্য্যায়ক্রমে এক একটি গাভী দোহন করা হইত। আর্য্যেরা সোমরস দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সুপেয় সুরা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা এই সুরার অতিশয় ভক্ত ছিলেন। ইহার ঘ্রাণে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিতেন, এবং ইহার আস্বাদে তাঁহারা অভিনব উৎসাহে পূর্ণ হইয়া মহত্তর কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতেন। বিবাহের সময়ে বর কন্যার গাত্রে দুগ্ধ ও মাখন মাখাইয়া দেওয়া হইত। কন্যাকর্ত্তা সমৃদ্ধ হইলে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য যৌতুক দিতেন। কোন কোন সময়ে এক হাজার গাভী দেওয়া হইত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন। পুত্রের অভাবে দৌহিত্র মাতামহের সম্পত্তি অধিকার করিত। উত্তরাধিকার ও ধর্ম্ম-

কার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা প্রবীণদিগের মত গ্রহণ করা হইত। যাঁহাদের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তাঁহাদের উপর এই সকল গুরুতর বিষয়ের বিচারভার সমর্পিত হইত না।

আর্য্যগণের মধ্যে সাধারণতঃ ধুতি পরার প্রথা ছিল। গায়ে চাপকানের মত একপ্রকার লম্বা অঙ্গাবরণ থাকিত; যুদ্ধযাত্রীরা কোমরবন্ধ ব্যবহার করিত; শিরোদেশে উষ্ণীষের আকারে চাদর থাকিত; চাদরের উভয় পার্শ্ব পশ্চাদ্দেশে ঝুলিত। পাদুকার মধ্যে এক প্রকার চটি জুতা প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা কর্ণে কুণ্ডল ও গলদেশে হার ধারণ করিতেন। এখন হিন্দুস্থানীরা যেমন কতকগুলি মোহর গাঁথিয়া গলায় পরে, সম্ভবতঃ আর্য্যেরা তখন স্বর্ণমুদ্রা সেইভাবে গলায় দিতেন। মহিলাগণের মধ্যে কর্ণাভরণ, শিরোভূষণ, হার, বালা, তাবিজ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে স্বর্ণাসন, ভোজনপাত্র, পানপাত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ চর্ম্মনির্ম্মিত থলিয়াতে জল রাখিতেন। এই থলিয়া চর্ম্মভাণ্ড নামে অভিহিত হইত। সমুদ্রযাত্রার জন্য নৌকা নির্ম্মাণের প্রথা ছিল।

প্রাচীন আর্য্যগণ যখন পঞ্চনদের বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছিলেন, তখন তাঁহারা প্রকৃতি-রাজ্যের এক একটি বিশেষ শক্তিকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করিতেন। অনন্ত তুষারমণ্ডিত হিমগিরি তাঁহাদের কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করিত। সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিলবিধৌত, শ্যামল ভূখণ্ড তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সঞ্চারিত করিত। এখানে বায়ুর অসীম প্রভাব, সূর্য্যের প্রচণ্ড মূর্ত্তি, অগ্নির তেজঃপ্রকাশক সুচঞ্চল শিখা দৃষ্টিগোচর হইত। তাঁহারা চারি দিকের

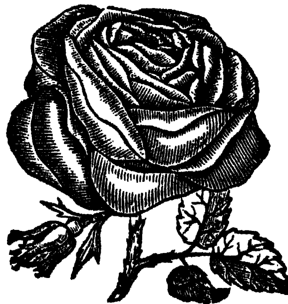
নিসর্গশোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। চারি দিকের নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রভাব দর্শনে তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিত। তাঁহারা নৈসর্গিক দেবগণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। যজমানের নিকেতনে বরুণ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা হইত। আর্য্যগণ অন্নাদি লাভের উদ্দেশ্যে বা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় এই সকল দেবতার স্তব করিতেন, এবং ইহাদিগকে ফল, মূল ও সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। তাঁহারা অনাবৃষ্টি হইলে বৃষ্টির প্রার্থনায় ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন, এবং সিন্ধু সরস্বতীর মনোহর শোভা ও শৈত্য প্রভৃতি গুণদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে উহাদের উদ্দেশে স্তুতিগীতি গান করিতেন। ভারতবর্ষবাসী আর্য্যদিগের উপাসনপদ্ধতি এইরূপ সরল ও প্রশান্তভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহারা ঋগ্বেদের মন্ত্র মাত্র আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই স্থলে প্রাচীন আর্য্যগণের কয়েকটি স্তোত্রের ভাবানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে;—"হে বায়ু! ধার্ম্মিকগণের উপর মধু বর্ষণ কর। হে নদীগণ! তোমরাও মধু বর্ষণ কর। হে লতাসকল! তোমরা মধুময় হও। হে পর্ব্বত! হে সমুদ্র! হে স্বর্গ! হে বৃক্ষহরিৎ পৃথিবী! হে উভয় লোক! আমাদের ধন রক্ষা কর। দূরদর্শী সূর্য্য! শুভোদয় হও। চতুর্দ্দিক্! প্রসন্ন হও। সুদৃঢ় পর্ব্বতগণ! নদি ও জল! প্রসন্ন হও। হে প্রশংসিত পর্ব্বতগণ! হে উজ্জ্বল নদীগণ! আমাদিগকে রক্ষা কর ও আশ্রয় দাও।" সরলহৃদয় আর্য্যদিগের স্তোত্র এইরূপ সারল্যপূর্ণ ছিল। তাঁহারা দেখিতেন, বায়ু দ্বারা তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইতেছে; সূর্য্য প্রাতঃকালে রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া, তাঁহাদিগকে দর্শনসামর্থ্য প্রদান করিতেছে; নদী দ্বারা তাঁহাদের বাস-

ভূমি উর্ব্বর হইতেছে; তাঁহাদের গোমেষসমূহ এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহারা ইচ্ছামত নদীর শীতল জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন; পর্ব্বত তাঁহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; সুতরাং তাঁহারা আপনাদের সুখবর্দ্ধন মানসে সরলভাবে উহাদের স্তব করিতেন। আর্য্যগণ সিন্ধুনদের প্রভাব দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন; এজন্য সিন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া, ভক্তিভাবে কহিয়াছেন, "পৃথিবী হইতে স্বর্গে ধ্বনি উত্থিত হয়; সিন্ধু গৌরবের সহিত অবিশ্রান্ত ধ্বনি করিতেছেন। সিন্ধু বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে আসিতেছেন, মেঘ হইতে যেন বজ্রনিনাদ বহির্গত হইতেছে।"

এই সময়ে লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। আর্য্যদিগের সমস্ত রচনা মুখে মুখেই চলিয়া আসিত। দেবগণের উদ্দেশে অনেক কবিতা রচিত ও গীত হইত। এই সকল কবিতা ঋগ্বেদের মন্ত্র নামে এখন সাধারণের নিকটে পরিচিত হইতেছে। এই স্থলে বলা উচিত যে, বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত। বেদের আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ, এই তিনটি অংশ আছে। সংহিতায় সরলভাবে উপাসনার মন্ত্র, ব্রাহ্মণে আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের পদ্ধতি এবং উপনিষদে পরমার্থ-চিন্তাঘটিত আলোচনা রহিয়াছে। এ সময়ে ঋগ্বেদের সংহিতা-মাত্র আর্য্যদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। এই সাহিত্যে ছন্দ বা অনুপ্রাসের অভাব নাই। অনেক স্থানে উদ্দীপনা, আবেগ ও কল্পনার লীলাতরঙ্গ রহিয়াছে। আর্য্যগণ দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদয়ে তাঁহাদের জাতীয় ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সকল রচনা কোম-

লতা, উদ্ভাবনা প্রভৃতি আদিম অবস্থার কবিত্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। উহার সকল স্থলেই সরলতা ও প্রশান্ত ভাব বিরাজ করিতেছে। আর্য্যগণ প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় পড়িলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহের আবির্ভাব হয়।

প্রাচীন আর্য্যদিগের এই সাহিত্যে তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের মহিমা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যগণ সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই দেবমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহারা দেবগণের নিকটে সুখাদ্য দ্রব্য, সুপেয় জল, সুস্থ সন্তান এবং বিপক্ষপরাজয়ের জন্য বিজয়িনী শক্তি প্রার্থনা করিতে কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের স্তোত্রের সকল স্থলেই প্রশান্ত ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মভাবের আতিশয্য প্রযুক্তই আর্য্যগণ সকল সময়ে দেবগণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন।



অশোক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ ও অশোকের আধিপত্য এক সময়ে আফগানিস্তান হইতে কটকের অন্তর্গত ধায়ুলি পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে অশোকের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। মহারাজ অশোক প্রচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য নরপতিদিগকে এতদূর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে কোনও ক্রমে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত করা যায় না।

মহারাজ অশোক সুপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্ররাজ বিন্দুসারের পুত্র। যে চন্দ্রগুপ্তের শাসনমহিমা এক সময়ে যুনানী সম্রাটগণের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছিল, যাঁহার সময় হইতে প্রাচীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও আলোকি[illegible] হইয়াছে, অশোক সেই মৌর্য্যকুলগৌরব মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।

বিন্দুসার যখন পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন চম্পাপুরীবাসী এক জন ব্রাহ্মণের নিকটে একটি কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। সুভদ্রাঙ্গীর বিষয়ে একদা গণকেরা কহিয়াছিলেন, ইনি এক জন প্রসিদ্ধ রাজার মহিষী ও এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মাতা হইবেন। ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করিবার আশায় তনয়াকে বিন্দুসারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন।

বিন্দুসার কন্যাটিকে পাইয়া অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীকে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদিগের নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা সুভদ্রাঙ্গীকে সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্য-সাধনে নিয়োজিত রাখিতেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি ক্ষৌর-কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। সুভদ্রাঙ্গী ইহাতে অপমান বোধ না করিয়া মনোযোগের সহিত ঐ কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদা রাণীগণের আদেশে তিনি মহারাজ বিন্দুসারের ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করেন। মহারাজ বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীর কার্য্যপটুতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহার যে কোন প্রার্থনার পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুভদ্রাঙ্গী ইহাতে বিন্দুসারের সহিত পরি-ণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিন্দুসার তাঁহাকে নীচবংশোদ্ভবা মনে করিয়া, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সুভদ্রাঙ্গী উত্তর করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণতনয়া। পিতা আপনার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াই, আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সুভদ্রাঙ্গীর এই কথায় পূর্ব্ব বিবরণ বিন্দুসারের স্মৃতিপথবর্ত্তী হইল। বিন্দুসার তাঁহাকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। সুভদ্রাঙ্গী ক্রমে নিজগুণে অন্তঃপুরের প্রধানা মহিষী হইলেন।

অশোক এই ব্রাহ্মণতনয়া সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র। কথিত আছে, পুত্রমুখদর্শনে মাতার শোক দূরীভূত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ সন্তান অশোকনামে অভিহিত হয়। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর কি শোক ছিল, তাহা প্রকাশ নাই। অশোক অতি কদাকার ছিলেন; আকৃতির সঙ্গে অশোকের প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়া ছিল। এজন্য তিনি "চণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিন্দুসার

পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থে পিঙ্গলবৎস নামক এক জন জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে সমর্পণ করেন। এইজ্যোতির্ব্বিৎ একদা গণনা করিয়া কহেন, অশোক পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। অশোক ব্যতীত সুভদ্রাঙ্গীর আরও একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁহার নাম বীতশোক বা বিগতশোক।

মহারাজ বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম সুসীম। ইঁহার সহিত অশোকের সম্প্রীতি ছিল না। এজন্য বিন্দুসার অশোককে স্থানান্তরে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিন্দুসার অশোককে ঐ বিদ্রোহ-দমনার্থে পাঠাইয়া দিলেন।

অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। অশোক বিদ্রোহদমনে কৃত-কার্য্য হইলেন। ইহার মধ্যে সুসীম পাটলীপুত্রে উৎপাত আরম্ভ করাতে মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিন্দুসার সুসীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া, অশোককে পাটলীপুত্রে আহ্বান করিলেন।

ক্রমে বিন্দুসারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। বিন্দুসার জীবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিলেন। তিনি আসন্নকালে অমা-ত্যের পরামর্শে কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ অমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুপ-স্থিতি পর্য্যন্ত অশোককে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। এদিকে সুসীম তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অশোক তাঁহার কার্য্যকুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাভূত ও নিহত করিলেন।

ইহার পর ভাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের আশঙ্কায় অশোক

স্বহস্তে রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এই রূপ অনেক কার্য্যে তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, কয়েকটি কামিনী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশোকবৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। এই অপরাধ গুরুতর মনে করিয়া, তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামক এক জন নরহন্তাকে আদেশ দিলেন। নিষ্ঠুর চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোরপ্রকৃতি প্রভুর এই কঠোর আজ্ঞা সম্পাদন করিল।

একদা সার্থবাহ নামক একটি ধনাঢ্য বণিক স্বপরিবারে এক শত বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। সমুদ্রবাসসময়ে তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; সার্থবাহ তাঁহার নাম সমুদ্র রাখেন। সার্থবাহ বাণিজ্যের নিমিত্ত দ্বাদশবর্ষকাল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন এক দল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে সপরিবারে নিহত করে। কেবল তাঁহার পুত্র সমুদ্র ঘটনাক্রমে পলায়ন করেন। সমুদ্র পিতৃমাতৃহীন হইয়া বৌদ্ধ যতিবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। একদা ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া, তিনি চণ্ডগিরিকের গৃহে উপস্থিত হয়েন। চণ্ডগিরিক এই বৌদ্ধ যতিকে নিহত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে চণ্ডগিরিক অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া এই বিবরণ অশোককে জানায়। মহারাজ অশোক সংবাদ পাইয়া, আগন্তুক যতিকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং চরিত্র দেখিয়া অশোকের

জ্ঞান লাভ হইল; নিজের চরিত্রসংশোধনের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু তিনি প্রথমে দুরাচার চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলেন না।

এই অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। অশোক ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ অশোকের ধর্ম্মগুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত মথুরার এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির তনয়। শোণবাসীনামক এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ইঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অশোককে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী ও সাধনা মহীয়সী করিয়া তুলিলেন। অশোক এইরূপে গুরুসহবাসে ও গুরূপদেশে ধর্ম্মনিরত ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। পবিত্র ধর্ম্মভাব তাঁহাকে দুঃশীলতার পরিবর্ত্তে সুশীলতায়, অনুদারতার পরিবর্ত্তে উদারতায় এবং ক্রূরতার পরিবর্ত্তে সদাশয়তায় সমলঙ্কৃত করিল। তিনি এখন স্বীয় অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, এবং উদার পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্র সমদর্শিতা ও ন্যায়পরতা দেখাইতে লাগিলেন। অশোক ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ধর্ম্মোপদেষ্টার অনুরোধক্রমে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থদর্শন মানসে দেশভ্রমণে বহির্গত হয়েন। লুম্বিনী নামক উদ্যানের যে বৃক্ষমূলে বুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; যে স্থান বুদ্ধের যৌবনকালের ক্রীড়াভূমি ছিল; যে বৃক্ষমূলে বুদ্ধ কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন; অশোক তৎসমুদয় পরিদর্শন পূর্ব্বক পবিত্রচিত্ত হয়েন। শেষোক্ত স্থানে অশোকের যত্নে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইরূপ ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় অশোকের প্রতিপত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হইল। নানা স্থানে স্তূপ ও মঠ প্রভৃতির নির্ম্মাণে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সকল ধর্ম্মসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠানে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হয়; তিনি "ধর্ম্মাশোক" নামে সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহার সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং এই ধর্ম্মের মহিমা ও এই ধর্ম্মের উন্নতিবিধানে সমুদয় সম্পত্তির ব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। বুদ্ধগয়ার যে তরুমূলে বসিয়া, মহামতি বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বোধীবৃক্ষের রক্ষাবিধানে তাঁহার একাগ্রতা ও চেষ্টা বলবতী হয়। মহারাজ অশোকের প্রধানা মহিষী পবিষ্যরক্ষিতা ভর্ত্তাকে পুরুষানুগত চিরন্তন ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ ও নূতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হয়েন। কথিত আছে, একদা পবিষ্যরক্ষিতা মাতঙ্গীনাম্নী এক চণ্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোধীবৃক্ষ বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন। চণ্ডালী যাদুবিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধপ্রয়োগে বৃক্ষটিকে ক্রমে বিশুষ্ক করিয়া তুলে। অশোক এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েন। রাণী তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় না। পরিশেষে পবিষ্যরক্ষিতার আদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটিকে পুনর্ব্বার সজীব করে; বৃক্ষের সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে অশোকও সজীব ও সুপ্রসন্ন হয়েন।

এই সময়ে তক্ষশিলা শান্তিপ্রবণ ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহে উহা সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ অশোক স্বীয়

পুত্র কুণালকে ঐ বিদ্রোহের দমন জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। কুণাল অশোকের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। অশোক কাঞ্চনমালা-নাম্নী একটি রূপবতী কামিনীর সহিত কুণালের বিবাহ দেন। কাঞ্চনমালার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। কুণাল সৈনিক-দলসমভিব্যাহারে তক্ষশিলায় উপনীত হইলে বিদ্রোহীদিগের দলপতি কুঞ্জরকর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এরূপ প্রবাদ আছে, কুণাল বিদ্রোহদমনার্থে তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলে অশোক একদা স্বপ্নে দেখিলেন, প্রাণপ্রিয় পুত্র কুণালের মুখ বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অশোক এই স্বপ্নের বিবরণ গণক-দিগকে জানাইলে তাঁহারা গণনা করিয়া কহিলেন, স্বপ্নে তিনটি অনিষ্ট সূচিত হইতেছে; প্রথম প্রাণহানি, দ্বিতীয় পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিবেশধারণ, তৃতীয় দর্শনশক্তির বিনাশ। মহারাজ অশোক প্রিয়তম পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনিষ্টের সূচনায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। ইহাতে অশোকের অন্যতমা মহিষী ও কুণালের বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা কুণালের অনিষ্টসাধনের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মতানুসারে আদেশলিপি প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার মতানুসারে কর্ম্মচারিগণ যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তিনি গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া কুঞ্জরকর্ণকে আদেশ করি-লেন যে, অবিলম্বে কুণালের দর্শনশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। পত্র রাজনামাঙ্কিত মোহরে শোভিত হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইল। কুঞ্জরকর্ণ এই পত্র পাইয়া, কি প্রকারে আদেশ পালন করিতে হইবে, ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে কুণাল রাজাজ্ঞা

জানিতে পারিয়া, আপনি কুঞ্জরকর্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া উক্ত আদেশলিপি দেখিতে চাহিলেন। কুঞ্জরকর্ণ কুণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু কি করেন, মহাপরাক্রান্ত কুণালের নিকটে বাক্‌চাতুরী করিবার তাঁহার ক্ষমতা হইল না। রাজলিপি কুণালের হস্তে সমর্পিত হইল। কুণাল ধীরে ধীরে পড়িলেন। পত্রে রাজার নাম, রাজার মোহর রহিয়াছে; সন্দেহ আর কিছুই রহিল না। তখন কুণাল কহিলেন, "কুঞ্জরকর্ণ! রাজাজ্ঞা পালন কর।" সহসা কুণালের মুখে এই কথা শুনিয়া, কুঞ্জরকর্ণ কি করিবেন,ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; কুঞ্জরকর্ণকে দোলায়মানচিত্ত দেখিয়া, কুণাল আবার বলিলেন, "তুমি আদেশপালনে নিরস্ত থাকিও না; রাজাজ্ঞায় অবহেলা করিলে আমি তাহার প্রতিফল এখনই দিব।" ইহা বলিয়া, কুণাল কটিদেশ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। সুতরাং কুঞ্জরকর্ণকে রাজাজ্ঞা পালন করিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। যাহা হউক, পরে অন্ধ কুণাল পরিব্রাজকবেশে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়া বহুকষ্টে পাটলীপুত্রে উপনীত হইলেন। তিনি গোপনে রাজকীয় হস্তিশালায় গিয়া, নিশীথ সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। ধ্বনি রাজবিলাসভবনের গবাক্ষদেশ দিয়া অশোকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। উহা অশোকের হৃদয়ের প্রতিস্তর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিল। মহারাজ অশোক নিশীথকালে দূরাগত বংশীধ্বনিতে সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি বংশীবাদককে নিকটে আনিতে লোক পাঠাইলেন। রাজার আজ্ঞায় যতিবেশধারী বংশীবাদক যথাস্থলে উপনীত হইলেন। তখন মহারাজ অশোক বিস্ময়সহ-

কারে দেখিলেন, বংশীবাদক—তাঁহার প্রিয়তম তনয়—কুণাল অন্ধ। অশোক কুণালের এই অবস্থা দেখিয়া অধীর হইলেন। কুণালকে ঈদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুণাল কিছুই বলিলেন না। পরে অশোক অপরের নিকটে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া, যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া, নীচাশয় ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মহিষীর শিরশ্ছেদের জন্য তরবারি গ্রহণ করিলেন। কুণাল পিতাকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে সমুদ্যত জানিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অশোক বিন্দুসারের জীবদ্দশায় কিয়ৎকাল উজ্জয়িনী রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক স্থলে পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণসময়ে একদা দেবীনাম্নী একটি পরমসুন্দরী রাজবালার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। দেবীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। ইঁহারা উভয়েই তরুণবয়সে সিংহল দ্বীপে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসন গ্রহণ করিবার সময়ে যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহার তাদৃশ নির্দ্দয়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। অশোক যখন সুসীম প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে সুসীমের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় চণ্ডালপল্লীতে যাইয়া এক জন চণ্ডালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অশোক এই সন্তানের জীবনের কোনরূপ

অনিষ্ট করেন নাই। কথিত আছে, সুসীমতনয় বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক যতিবেশে নানাস্থানপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়েন।

কথিত আছে, নূতন ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় আস্থা দর্শনে কতিপয় তীর্থক অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন। অশোক ভ্রাতাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার অমাত্য এই কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অমাত্য বীতশোককে যথাবিধানে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে কাতর হইলেন না। কিন্তু এই কার্য্যে অশোকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীতশোকের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার অমাত্য বহু চেষ্টা করিয়া বীতশোককে এক সপ্তাহের জন্য আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। সপ্তাহান্তে বীতশোক উপগুপ্তের আশ্রয়প্রার্থী হয়েন, এবং তদীয় শিষ্য গুণাকরের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরিব্রাজকত্ব অবলম্বন করেন।

বীতশোক এইরূপ পরিব্রাজক হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী এক সন্ন্যাসী আপনার প্রতিকৃতির পাদমূলে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, সেই আলেখ্য সমুদয় স্থানে প্রচার করেন। অশোক ইহা শুনিয়া; সেই ধর্ম্মদ্বেষ্টা চিত্রকরের মস্তকের জন্য একটি বিশেষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। অচিরাৎ এই প্রতিশ্রুতির বিষয় চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এক জন গোরক্ষক এই

সংবাদ শুনিয়াছিল ; সে একদা জটাচীরধারী, দীর্ঘশ্মশ্রু, অখণ্ডিত-নখ, বীতশোককে দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষ্টা সেই সন্ন্যাসী জ্ঞানে রাত্রিকালে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভের আশায় সেই ছিন্ন মস্তক অশোকের নিকটে লইয়া যায়। অশোক স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তক দেখিয়া, সাতিশয় শোকাতুর হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করেন, এবং এইরূপ নির্দ্দয়তা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা উপগুপ্তের পাদমূলে পতিত হয়েন। এই কাহিনী কতদূর সত্য, নির্দ্দেশ করা যায় না। বোধ হয়, বীতশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করাতে অশোকের সহিত তাঁহার অপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই এই কিংবদন্তী প্রচারিত হইয়াছে।

মহারাজ অশোক এক জন বৌদ্ধ যতিকে তাঁহার সাম্রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিয়োজিত করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণও নানা স্থানে প্রেরিত হয়েন। ইঁহারা সকল স্থলেই সাধারণকে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা, সত্য কথা, দান, জীবসমূহের প্রতি অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। 'অশোক প্রতি পঞ্চম বর্ষে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া, ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক শুনিতেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহামতি অশোক এই সম্প্রদায়সমূহের একীকরণ মানসে স্বীয় রাজ্যাব্দের অষ্টাদশ বর্ষে রাজ্যস্থিত সমস্ত জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে একটি মহতী সভায় আহ্বান করেন। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের শৃঙ্খলাবিধান ও অর্থনিরূপণের পর ধর্ম্মপ্রচারার্থে

স্থানে স্থানে প্রবীণ বৌদ্ধদিগকে প্রেরণের প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবানুসারে মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক এক জন প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়া এক লক্ষ সত্তর হাজার লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষার্থে দশ হাজার পুরোহিত নিয়োজিত হয়েন। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ কাশ্মীর, কান্দাহার, সিংহল প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। এইরূপে অশোকের উৎসাহে ও যত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়, এবং এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহত্ত্ব ঘোষণা করেন।

মহারাজ অশোক প্রজারঞ্জন করিয়া "রাজা" শব্দ অন্বর্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় অনুশাসনপত্রে আপনার বংশধরদিগকে প্রজাদিগের হিতৈষী হইতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন। অশোক প্রথমাবস্থায় পাপাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষাবস্থায় তাঁহার চরিত্র পবিত্র ও ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াছিল। তিনি রাজ্যের প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে কূপ খনন এবং স্থানে স্থানে পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবের রক্ষার্থে ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। তাঁহার হৃদয় অনুক্ষণ করুণার মাধুরীতে শোভিত থাকিত। তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়া, পরাজিত শত্রুদিগকে কখনও বিনষ্ট অথবা দাস করেন নাই। তাঁহার রাজ্যে ঘোরতর অপরাধীর প্রায়ই প্রাণদণ্ড হইত না। তিনি দোষী ব্যক্তিকে শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংযত করিবার জন্য ধর্ম্মোপদেশকের নিকটে প্রেরণ করিতেন।

অশোক কাহাকেও বলপূর্ব্বক আপন ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন না। তিনি কর্ম্মচারীদিগকে বারংবার আদেশ করিয়াছেন যে,

ভ্রষ্টাচারদিগকে উপদেশ দিয়া, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপথে আনিতে হইবে। তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ পরমসুখে ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। অশোক ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কখনও নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই। বরং তিনি স্বীয় ধর্ম্মলিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অগ্রে ব্রাহ্মণ, পশ্চাৎ শ্রমণদিগকে দান করিতে হইবে।

শাসনকার্য্যে অশোকের পক্ষপাত ছিল না। অশোক সমদর্শিতাগুণে সকলকেই সমান ভাবে দেখিতেন। তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কাতর হয়েন নাই, এতদ্ব্যতীত অশোক সৎপাত্রে অনেক অর্থ দান করিতেন। এক এক সময়ে তিনি দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ও মহিষীগণ সর্ব্বদা দান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে অর্থ পাইতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অশোকের আদেশে অনেক স্থানে সুদৃশ্য মঠ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজত্বে অনেক নগর সুশোভন অট্টালিকায় শোভিত হইয়া উঠে। অশোক তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান প্রদেশেই তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। নর্ম্মদা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, পঞ্জাব ও আফগানিস্তানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে, মহারাজ অশোকের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়া তাঁহার মহত্ত্ব, কীর্ত্তি ও প্রতাপ শত গুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মহারাজ অশোক এইরূপে ৩৭ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া লোকান্তরিত হয়েন। অদ্যাপি তাঁহার ধর্ম্মলিপিও অনু-

শাসনপত্রসমূহে তদীয় মহত্ত্বচিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহা-রাজ ধর্ম্মাশোকের নাম কখনও ইতিহাস হইতে স্খলিত হইবে না। তাঁহার মহাপ্রাণতা, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি, তাঁহার উদারতা এবং তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহাকে জগতের বরণীয় করিয়া রাখিবে। অশোকের নামান্তর প্রিয়দর্শী। তিনি বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়েন, এবং বুদ্ধের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

অশোকের মৃত্যুর পর তদীয় তনয়গণ তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুণাল পঞ্জাবের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই কুণালই ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাজকুমার জলোক কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; তৃতীয় পুত্র পাটলীপুত্রের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।



ভারতে গ্রীক

গ্রীকদিগের মধ্যে প্রথমে মাকিদনের অধিপতি মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতে প্রবেশ করিয়া বেদকীর্ত্তিত পঞ্চনদে জয়-পতাকা স্থাপন করেন। পূর্ব্বে পারস্য দেশের রাজগণ অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অন্যতম পারসীক ভূপতি দরায়ুস হস্তাস্প্ এক বার সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন। কালে পারস্য রাজ্যে নানা প্রকার গোলযোগ হইলে সেকন্দর পারস্য অধিকার করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন, এবং আটকের উজানে সিন্ধুনদ পার হইয়া বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় তক্ষশিলা দিয়া, বিতস্তার নিকটে আইসেন। এ স্থলে বলা উচিত যে, তক নামক তুরেণীয় জাতি হইতে এই নগরের নাম "তক্ষশিলা" হয়। এই জাতি রাবলপিণ্ডীর আদিম নিবাসী। এ সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সেকন্দর আসিয়া দেখিলেন, পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একতা নাই; রাজারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত; অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তাঁহার সাহায্যে উদ্যত। কিন্তু সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইলেন না। এই খণ্ডরাজ্যের পুরু-নামক এক জন রাজা ত্রিশ হাজার পদাতি, চারি হাজার অশ্বারোহী, তিন শত যুদ্ধরথ ও দুই শত হস্তী লইয়া, সেকন্দ-রের বিরুদ্ধে বিতস্তার নিকটে উপনীত হইলেন। যে চিনিয়া-

বালায় শিখগণ ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহারই প্রায় ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে সেকন্দরের সহিত পুরুর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেকন্দর বিজয়ী হয়েন। কিন্তু তিনি বিজয়গৌরবে অধীর হইয়া বিজিতের প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শন করেননাই। সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বীর অসাধারণ সাহস, পরাক্রম ও দেশহিতৈষিতা দর্শনে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরু এইরূপে আপনার বিজেতার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠেন। সেকন্দর আপনার জয়লাভের স্মরণসূচক দুইটি নগরপ্রতিষ্ঠা করেন। একটির নাম বুকৃফল। সেকন্দরের প্রিয়তম বাহন বুকৃফল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহার নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয়। ইহা বিতস্তার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান জলালপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। আর একটির নাম নিকেয়া, বিতস্তার পূর্ব্ব পারে। অধুনা এই স্থান মঙ্গ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইহার পর সেকন্দর অমৃতসর দিয়া বিপাশার তটে উপনীত হয়েন। শিখ ও ইংরেজদিগের যুদ্ধক্ষেত্র সোব্রাওঁর নিকটে তাঁহার জয়শ্রীসম্পন্ন সৈন্য আপনাদের জয়পতাকা উড্ডীন করে। সেকন্দর পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তটে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈনিকগণ নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য তাহারা অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সেকন্দর ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি দক্ষিণ পঞ্জাবে আলেকৃজান্দ্রিয়া, এবং সিন্ধুদেশে পাতাল নামক নগর স্থাপন করেন। আলেকৃজান্দ্রিয়া, এখন উচ্ নমে প্রসিদ্ধ। পাতাল সিন্ধুর বর্ত্তমান রাজধানী হয়দরাবাদ।

সেকন্দর পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত

করেন। ইহার মধ্যে তিনি কোন প্রদেশ আপনার অধীন করেন নাই। পরাজিত রাজার সহিত মিত্রতাস্থাপন, অভিনব নগর-প্রতিষ্ঠা এবং তৎসমুদয়ে গ্রীকসৈন্যের সন্নিবেশকার্য্যেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আফগানিস্তানের সীমান্তভাগ হইতে বিপাশা পর্য্যন্ত, এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত, প্রায় সমগ্র ভূভাগ তাঁহার বিজয়চিহ্নে অঙ্কিত ছিল। তিনি অনেক রাজ্য আপনার সাহায্যকারী সামন্তদিগকে দান করেন। উত্তর পঞ্জাবের তক্ষশিলা ও নিকেয়াতে দক্ষিণ পঞ্জাবের আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে এবং সিন্ধুর পাতালে গ্রীকদিগের অথবা বন্ধুরাজগণের সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বক্ট্রিয়াতে (বল্‌ক্‌) অনেক সৈন্য অবস্থিতি করে। সেকন্দরের মৃত্যুর পর তদীয় সাম্রাজ্যের বিভাগসময়ে সেলুকস্ নিকেতর নামক গ্রীক সেনাপতি বক্ট্রিয়া এবং ভারতবর্ষের অংশ প্রাপ্ত হয়েন।

এই সময়ে গঙ্গার তটে একটি অভিনব রাজ্য স্থাপিত হয়। আপনার জন্য কোন রাজ্য লইবার, অথবা আপনার কোন শত্রুকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করিয়া, যেসকল সাহসী ও সমরপটু ভারতীয় বীর সেকন্দর শাহের শিবিরে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তনামক এক ব্যক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সমকালে রাজগৃহ মগধের (বিহারের) রাজধানী ছিল। কিন্তু অজাতশত্রু রাজগৃহ ছাড়িয়া পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর স্থাপন করে। এই অবধি পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী হয়। সেকন্দরের সমকালে নন্দবংশীয় শূদ্র রাজারা পাটলীপুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের এক জন রাজার মুরা নাম্নী একটি দাসীর পুত্র। এজন্য তিনি মৌর্য্যবংশীয় বলিয়া

প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্ত পরিশ্রান্ত গ্রীকদিগকে গঙ্গার প্রসন্নসলিল-বিধৌত শস্যসম্পত্তিপূর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে আসিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। চন্দ্রগুপ্ত ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। তিনি আপনার বাহুবল, এবং চাণক্যের মন্ত্রশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, মগধে আধিপত্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা ছিল। এক জন সাহসে, বীরত্বে ও মন্ত্রশক্তিতে প্রবল হইলে তিনি অপরের সিংহাসন অধিকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনার অভীষ্ট কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। অনার্য্যগণ আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত আচারব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় দ্বিজ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। তাহাদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছিল। তাহারা যে, নীচবংশসম্ভূত, বিজেতা আর্য্যদিগের অনুকম্পাবলে যে, তাহাদের অবস্থা উন্নত হইয়াছে, ইহা এখনও তাঁহাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এ দিকে অপেক্ষাকৃত দাম্ভিক ও উদ্ধত আর্য্যগণের দোষে সময়ে সময়ে তাহারা নিগৃহীত হইত। এই সকল আর্য্য, তাহাদের বংশের হীনতা এবং তাহাদের পূর্ব্বতন অসভ্যতার উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেন। সুতরাং শূদ্রগণ যে কোন উপায়ে হউক, আপনাদের প্রাধান্য ও দ্বিজাতির উপর আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টায় ছিল। যখন মহামতি শাক্যসিংহ সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী ইতর, সকলকে এক ভূমিতে একত্র করিবার চেষ্টা করেন, তখন শূদ্রগণ আশ্বস্ত হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষায়

থাকে। ইহার পর শূদ্রবংশসম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত যখন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার ইচ্ছা করেন, তখন অনেকে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। চন্দ্রগুপ্ত অবিলম্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং নন্দবংশের ধ্বংশাবশেষে আপনার গৌরবের মহিমায় সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হয়েন। এই চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীন করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাম্রলিপ্তি (তমোলুক) পর্য্যন্ত তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। পূর্ব্বতন রাজগণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেই আপনাকে "মহারাজচক্রবর্ত্তী" বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক এই গৌরবসূচক উপাধি লাভ করেন। আর্য্যগণ যে শূদ্রদিগকে দাস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাই এখন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসের বরণীয় হইয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের নাম তাঁহাদের শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর কোন রাজা সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

সেলুকস খ্রীষ্টাব্দের ৩১২ হইতে ২৮০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরীয়ায় রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টাব্দের ৩১৬ হইতে ২৯২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মগধসাম্রাজ্য শাসন করেন। সেকন্দরের মৃত্যুর পর সেলুকস যখন স্বকীয় রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনার অধিকার প্রসারিত করেন। উভয়ের রাজশক্তি যখন বদ্ধমূল হয়, তখন উভয়ে

আত্মপ্রাধান্য দেখাইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ের সম্মুখীন হয়েন। এই যুদ্ধে সেলুকসের পরাজয় হয়। পরাক্রান্ত সেকন্দর শাহ পুরুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেকন্দরের সেনাপতি পরাক্রান্ত সেলুকস, চন্দ্রগুপ্তের নিকটে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অনুদারপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি বীরত্বগন্ধ বন্ধুতার গৌরব হরণ করিলেন না, সেলুকসকে আদরসহকারে গ্রহণ করিয়া পাঁচ শত হস্তী উপহার দিলেন। এ দিকে সেলুকস পঞ্জাবস্থিত গ্রীক অধিকারের সহিত আপনার প্রিয়তমা দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীককুমারীর বিবাহ হইল। সেলুকস জামাতার সভায় এক জন দূত রাখিলেন। এই দূতের নাম মেগাস্থিনিস্। ইনি খ্রীষ্টাব্দের অনুমান ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রে ছিলেন।

মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও কোন কোন স্থলে অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিবরণ মনোযোগের সহিত পড়িলে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। উহা দৈর্ঘ্যে আট মাইল এবং বিস্তারে দেড় মাইল। নগরের চারি দিক গড়খাই করা। গড়ের বিস্তার ৪০০ হাত এবং গভীরতা ৩০ হাত। গড়ের পর আবার একটি কাষ্ঠময় প্রাচীর। প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ এবং ৫৭০টি গুম্বজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাণনিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের স্থানে স্থানে ছিদ্র ছিল।

ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত। প্রতি রাজ্যে অনেকগুলি নগর ছিল। সে সকল নগর নদীতটে বা সাগরের উপকূলে অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত; আর যে গুলি পাহাড় বা উচ্চ স্থলে অবস্থিত, সেগুলি ইষ্টক বা মৃত্তিকায় প্রস্তত হইত। ভারতবর্ষীয়েরা নিম্নলিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল:—

১ম শ্রেণী। তত্ত্ববিৎ।—ইহারা সকল সম্প্রদায়ের মান্য এবং যজ্ঞ প্রভৃতিতে লোকের সাহায্যদাতা ছিলেন। বৎসরের প্রারম্ভে ইহারা এক বার রাজসভায় আহূত হইতেন। কেহ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা মারীভয় প্রভৃতিতে সাধারণের উপকার সাধন উদ্দেশে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকিলে, তাহা এই সময়ে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। রাজা পূর্ব্বে এই সকল বিষয় জানিয়া বিপত্তিনিবারণে যত্নশীল হইতেন। এ সময়ে যদি কেহ তিন বার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইত; আর যিনি প্রামাণিক কথা প্রকাশ করিতেন, তিনি করভার হইতে বিমুক্ত হইতেন। তত্ত্ববিদ্গণ দুই দলে বিভক্ত;—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণেরই সম্মান অধিক। ইহারা বাল্যকাল হইতেই নগরের বহিঃস্থ উপবনে বাস করিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ইহাদিগকে মাংসাহার ও সর্ব্ব প্রকার বিলাসসুখ হইতে বিরত থাকিতে হইত। ইহারা মিতাচার অবলম্বন পূর্ব্বক কুশাসন বা মৃগচর্ম্মের শয্যায় শয়ন করিতেন। ৩৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে থাকিয়া ইহারা গৃহস্থ হইতেন। তখন ইহারা কার্পাসবস্ত্র পরিধান. স্বর্ণাভরণ ধারণ ও মাংসাহার করিতেন,

এবং বহুসন্তানকামনায় বহু নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেন।

শ্রমণেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল বনে বাস করিতেন। আরণ্য বৃক্ষের পত্র ও ফল ইঁহাদের প্রধান খাদ্য, এবং আরণ্য বৃক্ষের বঙ্কল ইঁহাদের পরিধেয় ছিল। কোন বিষয় জানিতে হইলে, রাজারা ইঁহাদের নিকটে দূত পাঠাইতেন। অপর দল, ভিষক্। ইঁহারা যদিও লোকালয়ে বাস করিতেন, তথাপি মিতাচারী ছিলেন, সাধারণতঃ ভাত বা যবের মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ইঁহাদের ঔষধ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহারা তৈল ও প্রলেপকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করিতেন। ইঁহাদের পথ্যের ব্যবস্থায় রোগের উপশম হইত।

২য় শ্রেণী। কৃষক।—দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ধীর, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইহাদিগকে অন্য কর্ম্ম করিতে হইত না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এরূপও দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, নিকটে কৃষকগণ আবাধে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। কৃষকেরা আপনাদের স্ত্রীপুত্রের সহিত গ্রামে বাস করিত, কখনও নগরে যাইত না। সৈনিকগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। প্রায় সমগ্র জনপদ শস্যসম্পত্তিশোভিত ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত ছিল। রাজাই ভূমির অধিস্বামী ছিলেন। কৃষকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের একচতুর্থাংশ পাইত। এইরূপে প্রতি বৎসর অনেক শস্য রাজকীয় ভাণ্ডারে জমা হইত। ইহার কতক অংশ ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইত, কতক অংশ রাজকর্ম্মচারী ও

সৈনিকগণের ভরণপোষণ, এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষাদির নিবারণ জন্য রাখা হইত।

৩য় শ্রেণী। পশুপালক ও শিকারী।—পশুপালন, পশুবিক্রয় ও শিকার ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা হিংস্র পশুসমূহের হত্যায় নিযুক্ত থাকিত, এবং শস্যের অনিষ্টকারী বিহঙ্গকুল বিনষ্ট করিয়া কৃষকের উপকার করিত। নগরে বা পল্লীতে ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহ ছিল না। ইহারা প্রায়ই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। এজন্য ইহারা তাম্বুতে বাস করিত।

৪র্থ শ্রেণী। শিল্পকর।—ইহাদের কেহ যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম, কেহ কৃষিকার্য্যের জন্য যন্ত্র, কেহ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কোন কোন শিল্পকরকে কর দিতে হইত, কিন্তু যাহারা রাজার জন্য জাহাজ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত, তাহারা রাজকোষ হইতে আপনাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থ পাইত। প্রয়োজন অনুসারে বণিকেরা রাজকীয় তরীর অধ্যক্ষের নিকটে আবেদন করিয়া, এই সকল জাহাজ ভাড়া করিয়া লইত।

৫ম শ্রেণী। যোদ্ধা।—ইহারা সুশিক্ষিত ও যুদ্ধকুশল ছিল। সংখ্যায় ইহারা কেবল কৃষকদিগের নীচেই স্থান পাইত। শান্তির সময়ে ইহাদের কোন কর্ম্ম থাকিত না। তখন ইহারা কেবল আমোদপ্রমোদে কাল কাটাইত। রাজা সমগ্র সৈন্যের ভরণপোষণ, এবং যুদ্ধোপকরণসংরক্ষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

৬ষ্ঠ শ্রেণী। চর।—ইহারা রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহা রাজাকে,—যেখানে রাজা নাই, সেখানে প্রধান শান্তিরক্ষককে জানাইত।

৭ম শ্রেণী। মন্ত্রী।—ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প, কিন্তু চরিত্র-

গুণে ও অভিজ্ঞতায় অপরাপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সম্মানিত। রাজার পরামর্শদাতা, কোষাধ্যক্ষ ও বিচারপতি, এই শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রধান শান্তিরক্ষক ও সেনাপতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের বিবাহ হইত না, কিংবা এক শ্রেণীভুক্ত লোকের ব্যবসায় অন্য শ্রেণী-ভুক্ত লোক অবলম্বন করিত না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত। লোকে ধুতি পরিত এবং একখানি উত্তরীয়ের কিয়দংশ মাথায় জড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া দিত। কিন্তু যাহারা সৌখীন ও বেশভূষাপ্রিয়, তাঁহারা স্বর্ণখচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন। কোন স্থানে যাইবার সময়ে অনুচরগণ তাঁহাদের মস্তকের উপর ছাতা ধরিত। রুচিভেদে লোকে আপ-নাদের দাড়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছাতা ব্যবহার করিতেন, এবং শ্বেত চর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিতেন। রাজকীয় কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এক এক শ্রেণী এক এক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। দেশের লোকে মিতাচারী ছিল। ইহারা যজ্ঞ ভিন্ন মদ্যপান করিত না; সত্যও ধর্ম্মের সম্মান করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য প্রায় হইত না। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারি লক্ষ লোক থাকিত, কিন্তু তথায় দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিত। লোকে উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে থাকিত না, কদাচিৎ মোকদ্দমা করিতে অগ্রসর হইত। ইহারা প্রায়ই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। দণ্ডবিধি বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ কোন

গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার হস্তপদাদি ছেদন করা হইত। পল্লীসমাজ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডল পল্লী-সমাজে আধিপত্য করিতেন। ভূমির মাপ, গ্রামের লোকের মধ্যে বিচার, কৃষিক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জলসেচন, করসংগ্রহ, ব্যবসায়বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন, পথের সংস্কার, এবং সীমা স্থির করার ভার, ইহার উপর সমর্পিত থাকিত। ভূমি শস্যশালিনী ছিল। বৎসরে দুই বার শস্য কাটা হইত। সুখাদ্য ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। পথের দূরত্বজ্ঞাপক প্রস্তরকীলকসমূহ স্থানে স্থানে প্রোথিত থাকিত। সাধারণ লোকে অশ্বে, উষ্ট্রে ও গর্দ্দভে চড়িত। রাজা ও ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেবল সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বাহন—হস্তীতে আরোহণ করিতেন। সৈনিকগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ ঢাল বড়শা ও খড়্গ ব্যবহার করিত। পদাতিকের এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ, আর এক হস্তে ঢাল থাকিত। ধনুক প্রায় মানুষের সমান, এবং প্রায় তিন গজ লম্বা ছিল। যোদ্ধারা এই ধনুক মাটিতে রাখিয়া, বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, বাণ নিক্ষেপ করিত। অসি লম্বায় তিন হাতের অধিক হইত না। শত্রুপক্ষ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, যোদ্ধারা দুই হাতে অসি চালাইত। যুদ্ধরথে সারথি ব্যতীত দুই জন রথী, এবং রণমাতঙ্গে মাহুত ব্যতীত তিন জন যোদ্ধা থাকিত। উৎসবের সময়ে স্বর্ণরৌপ্যবিভূষিত হস্তী, শকটসংযোজিত সুসজ্জিত অশ্ব ও বলদ, এবং সুশিক্ষিত সেনা ধীরে ধীরে চলিত। লোকে রত্নখচিত পাত্র, সুশোভিত সিংহাসন ও বিচিত্র বস্ত্রাদি বহন করিত। পোষিত সিংহ, ব্যাঘ্রও সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং সুকণ্ঠ ও সুদৃশ্য বিহঙ্গশোভিত বৃক্ষসমূহ বৃহৎ বৃহৎ শকটে চালিত

হইত। কন্যা বিবাহযোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে, পিতা কোন সময়ে তাহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; যিনি শক্তি প্রকাশ করিয়া কোন বিষয়ে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। কোন স্থানে দাসত্ববন্ধন ছিল না। কুলকামিনীগণ স্বতীত্বগৌরবে উন্নত ছিল। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। রাত্রিতে তিনি এক শয্যায় শুইতেন না; ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় সময়ে সময়ে শয্যা পরিবর্ত্তন করিতেন। অস্ত্রধারিণী মহিলারা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ার সময়ে রাজার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

খ্রীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়-দিগের সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে জানা যাইতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর যে, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়, মেগাস্থিনিস্ বোধ হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মেগাস্থিনিস যে সাত শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ সাত জাতি নহে; এই সকল লোক অবলম্বিত কার্য্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল। চর ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। কার্য্যভেদে ইঁহাদের শ্রেণী বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু জাতিতে ইঁহারা বিভিন্ন নহেন। ইহার পর মেগাস্থিনিস তত্ত্ববিদ্গণের সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রমাদদূষিত বোধ হয়। যে সে লোক শ্রমণ হইতে পারিত দেখিয়া, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে সকল শ্রেণীর লোকেই তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত। কিন্তু জাত্যভি-মানী ব্রাহ্মণেরা যে, অপর লোককে আপনাদের শ্রেণীতে গ্রহণ

করিতেন না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই কয়েকটি অনবধানতার বিষয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, খ্রীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মনুর ব্যবস্থা অনুসারেই সমাজের কার্য্য চলিতেছিল। ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও মন্ত্রিত্ব করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন। বৈশ্যেরা শিল্প ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত ইতর শ্রেণীর লোকে পশুবিক্রয় প্রভৃতি কর্ম্ম করিত। কেবল শূদ্রগণ এ সময়ে মনুর ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহারা দাসত্বে নিযুক্ত ছিল না। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে দাসত্বের অভাব দেখিয়াছেন। শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের ন্যায় শিল্পকর ও কৃষিব্যবসায়ী ছিল।

ভারতবর্ষ একচ্ছত্র ছিল না। যেহেতু মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে ১১৮টি খণ্ডরাজ্য দেখিয়াছেন। কেবল চন্দ্রগুপ্ত আপনার ক্ষমতাবলে তাম্রলিপ্তি হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত, সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার পূর্ব্বক একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ কোন সময়ে এক রাজার অধীন ছিল না, এবং কোন সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একতা দেখা যায় নাই।



ঝিন্দন

ঝিন্দন ভারতীয় ইতিহাসপটের একখানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচকগণ উহা লইয়া কৌতুকপ্রিয় জনগণের সমক্ষে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই আস্ফালন যাহারা দেখিতেছে, অথবা লোকপরম্পরায় উহার কাহিনী শুনিতেছে, তাহাদের কেহ অট্টহাস্যে করতালির ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে; কেহ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া, একটি অসহায় পতিত জাতির দেহে কলঙ্কপঙ্ক ঢালিয়া দিতেছে; কেহ দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জ্জনী-সঞ্চালন করিতেছে, এবং কেহ বা নির্জ্জনে গম্ভীরভাবে অতীত ঘটনার পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে। এই আস্ফালন বিচিত্র কি?

আমরা বলি, এই আস্ফালন কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম, অথবা প্রকৃতিতরঙ্গিণীর অবশ্যম্ভাবী তরঙ্গলীলা। যখন যাহা পরিদৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিস্তার করে, মানবকল্পনা তখনই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্গত ধর্ম্ম নানা বর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই কল্পনার বলে, সে হয় ত সমাজে পূজনীয় হইয়া অনেকের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হয়; অথবা হয় ত কলঙ্কপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া, ধিক্কারের অদ্বিতীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনান্ত-বিহারিণী বিহঙ্গী যখন মানবের অগম্য কাননে থাকিয়া, অনন্ত

নীলাকাশে মৃদুমধুর সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করে, এবং আপনার সৌন্দর্য্যমহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামল তরুর শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষয় আলোচনা করে? কোন্ প্রাণিবৃত্তান্তের প্রতিপত্র তাহার স্তুতিগীতিতে পরিপূরিত হয়? কোন্ কঠোর সমালোচকের সমালোচনার তীব্র বাণে তাহার অযত্নরক্ষিত সুন্দর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোকের নেত্রপথবর্ত্তিনী হয়, তখন উহার বিষয়ে কত তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী উহার বংশ, গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কত বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ-বিযুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহ বা বিরাগে, বিতৃষ্ণায় উহার কোমলদেহবিচ্ছিন্ন কোমলপালকরাশি নিক্ষেপ করিয়া, আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

ঝিন্দন যদি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর ন্যায় আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধভাবে আপনার মহিমা বিকাশ করিয়া, আপনিই সুখী হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিষাক্ত বাণ বা প্রীতিপুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্তপ্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দুর ন্যায় অথবা অনন্ত-বিস্তৃত জলধিহৃদয়ে নগণ্য জলবিম্বের ন্যায় তিনি নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু ঝিন্দন এরূপ নীরবে সমুত্থিত হয়েন নাই। অনেকে বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাঁহার সমুত্থান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁহার সমুত্থান, আশঙ্কার উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটর্লুর ভীষণ ক্ষেত্রে যাহারা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে নাই, পলাশীর শোণিতস্রোতদর্শনে

যাঁহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্যাধারণে যাঁহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, যাঁহারা বারিধিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া, সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, যাঁহাদের প্রভুশক্তির নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছে, ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিকপ্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও ঝিন্দনের তেজস্বী হৃদয় বিচলিত করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে, বৈদেশিক সমালোচকগণ আস্ফালন করিবেন, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, ঝিন্দন যাঁহাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, যাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারাই ঝিন্দনের চরিত্রপটের চিত্রকর হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে তাহাদের আস্ফালন আপনা হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মানবমন সহজেই দুর্ব্বল, সহজেই চঞ্চল, সহজেই তারল্যবিকাশক। উহা ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অপরূপ সংসার প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদ্মপত্রের উপর বারিবিন্দু যত ক্ষণ স্থিরভাবে থাকিতে পারে, ততক্ষণ মন যদি ধীরতা ও বিবেকবিহীন হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাবে যদি অকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঝিন্দনের চরিত্রের অঙ্কনে নিঃসন্দেহ সেই অকার্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত না করিলে চিত্রখানি যেরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে ঝিন্দনের চরিত্রচিত্রও ঠিক সেইরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অস্পৃশ্য, ঘৃণার্হ সামগ্রী আছে, চিত্রকর অম্লানবদনে—অসঙ্কুচিতহৃদয়ে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ঝিন্দনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই চিত্রের উপাদান, এবং একটি নারীকে কলঙ্কিনী করিয়া, তৎসংসৃষ্ট একটি প্রবল জাতির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপাদনকরাই, এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই উপাদানসঙ্কলনে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভারবহনে কিছুমাত্র কাতর হয়েন নাই, ইহার উৎকট দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করেন নাই। সংসারবিরাগী, পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায় তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই অবিকারচিত্তে আদর-সহকারে হস্তে লইয়া আপনার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। ইহাতে ঘৃণা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া, তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনও স্থলে কমনীয়তার বিকাশ নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফূর্ত্তি নাই, বা কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিভ্রম নাই। অবায়ুসন্তাড়িত অপার জলধিতে যেমন নিরবচ্ছিন্ন নীলিমা ভাসিয়া বেড়ায়, নিবিড় জলধরপটলে আচ্ছাদিত গগনে যেমন নিরবচ্ছিন্ন কালিমা লীলা করে, এই চিত্রের প্রতিরেখাতে সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন

কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। কঠোরহৃদয়, অস্ত্রধারী, নরঘাতকের রোষকষায়িত, তীব্র দৃষ্টিতে অথবা পরদ্রোহী, পরদারসেবী, সুরাসক্ত, দুরন্ত নরপশুর পিশাচপ্রকৃতিতেও মাধুর্য্যের বিকাশ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু এই চিত্রের কোথাও মাধুর্য্যের আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। কালের করাল রাজ্যে তীব্র হলাহলময় যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঝিন্দনের ও ঝিন্দনসংস্পৃষ্ট জাতির সহিত যাহাদের সমবেদনা নাই, ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভ নাই, তাহারা যে, এই কলঙ্কময় চিত্র দেখিয়া ঘোরতর করতালিধ্বনির সহিত উপহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে, ভারতীয় ইতিহাস-পটে এই রূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, ধীরতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, ঝিন্দনের সহিত বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া ঝিন্দনের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাদের ক্ষমতায় পূর্ব্বোক্ত কালিমা অপসারিত হইয়া ঝিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা যদি এ কথা স্বীকার না করি, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষপ্রকৃতি। দরিদ্র, নিপীড়িত ও অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত এই অপক্ষপাত পুরুষশ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

কি কি পাপকার্য্য দেখাইয়া বৈদেশিকগণ ঝিন্দনকে কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করিব না। ঝিন্দন ধীরে ধীরে যখন রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের

অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিতের সহধর্ম্মিণী-রূপে পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার রেখাপাত করেন, এবং ধীরে ধীরে যখন লাহোরের দরবারে রাজনীতির পর্য্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তাঁহার যেরূপ পাপীয়সী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার পর ঝিন্দন যখন নিয়তিনেমির বহুবিধ আবর্ত্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিধিবেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্টলিপি তাঁহার জীবনস্রোত অনন্ত কালসাগরে মিশাইয়া দেয়, তখনও ঝিন্দনকে সদয়ভাবে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অধিক কি, যে সকল পুরুষসিংহ আপনাদের অসাধারণ মহাপ্রাণতা ও অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া, এক সময়ে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সহৃদয়গণ আজ পর্য্যন্ত যাঁহাদের অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতার সম্মান করিয়া আসিতেছেন, কলঙ্কিনী ঝিন্দনের সংশ্রবে থাকাতে তাঁহারাও কলঙ্কী হইয়া ইতিহসের পত্রে পত্রে লীলামর্কটের ন্যায় নর্ত্তিত হইতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক, এরূপ স্তূপে স্তূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, ভারতমহাসাগর শত বর্ষ পরিশ্রম করিয়াও, উহা প্রক্ষালিত করিতে পারিবে না। হিমালয় গগনস্পর্শী শৃঙ্গাবলী পাতিত করিয়াও উহা ধূলিরাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা ঝিন্দনকে চিরকাল সদয়ভাবেই দেখিব; কঠোর আঘাতে যে অবলার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাকে

আবার পদাঘাত করা যে মহাপাপ, চিরকাল তাহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী। অবলা চিরদিনই দয়ার পাত্রী। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহু লোকে বহু দিক হইতে একটি অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য ভর্ৎসনার সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহার হৃদয়-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে, এবং তাহার মৃত্যু হইলেও নিরস্ত না হইয়া অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তদীয় পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছে, তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃত দেহে আঘাত করিতে উদ্যত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাহার শত্রুদিগের উদ্ঘোষিত নিন্দাবাদের পুনরুদ্ঘোষণ করে? এই জন্যই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ ঝিন্দনের চরিত্রে যে যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এ স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঝিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় সত্য হইলে প্রকাশ করায় দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, লোকে ঝিন্দনকে যে যে বিষয়ে কলঙ্কিনী বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না, তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদয় উপযুক্ত প্রমাণে দৃঢ়তর করেন নাই। সুতরাং তৎসমুদয়ের উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এ দিকে ঝিন্দনের যে, অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতায় একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায়

বিষম অন্তর্দ্দাহে অধীর হইয়া ঝিন্দনকে সাধারণের নিকটে অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি ? হইতে পারে, ঝিন্দন অবলাসুলভ কোমলতার বশীভূত হইয়া এক জনের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা এক জনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে,পঞ্চনদের অধীশ্বরীর এইরূপ পক্ষপাত দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য ঝিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। কিন্তু "অপরাধিনী" বলিবার পূর্ব্বে এক-বার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব। অনুগ্রহপ্রদর্শন ও ভালবাসা অবলাহৃদয়ের অনিবার্য্য ধর্ম্ম। ঝিন্দন অবলাহৃদয়ের অধিকারিণী হওয়াতেই এইরূপ অবলাধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিল না। যাঁহারা জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে যেরূপে আপনার প্রভুত্ববিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইবে। ঝিন্দন যখন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চনদ তাঁহার তেজোমহিমার নিকটে মস্তক অবনত করিল। দরবারের অমাত্য-গণ তখন তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎ সিংহের উপযুক্ত মহিষী বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং রাজ্যের প্রজাগণ তখন তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্রী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দনের এই তেজস্বিতা, প্রজালোকের

এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ঝিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে। ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্ভে থাকিয়া, আপনার প্রভায় আপনিই দীপ্তি পাইতেছিলেন, এখন খনির গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে সেই দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎ-সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির পর পঞ্জাব যেরূপ অন্তর্বিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তাহা ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপ সিংহ এই সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে দরবারে উপ-স্থিত হইয়া, রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন, এবং প্রতিদিনই স্বীয় শিশুপুত্রের রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য রাজনীতির মর্ম্মোদ্ভেদপূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। যে দুই প্রতিকূলপ্রবাহ পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে হিংসাপরায়ণ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে-ছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহা এক স্রোতে মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, হস্তাহস্তি ও শোণিতস্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে পরস্পর পরস্পরকে রোষকষায়িতভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একপ্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতি-ভাবে আলিঙ্গন করে। যাঁহার হৃদয় এইরূপ তেজস্বিতায়

পরিপূর্ণ, যাঁহার মন এইরূপ অটলতায় সংযত, তিনি কখন অসার বা অপদার্থ হইতে পারেন না।

যখন ঝিন্দন পঞ্জাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় ব্যাপৃত, রাজা লাল সিংহ তখন উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত। লাল সিংহের কোনও অমাত্যোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিত। লাল সিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন সময়ে তাঁহার কোনও গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন করে নাই; শাসনক্ষমতা কেবল অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া, রাজ্যের উন্নতিসাধন করে নাই; রণনিপুণতা কেবল তোষামোদপ্রিয় কুপোষ্যসম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈনিকদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলতঃ লাল সিংহ শিখসমাজে ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। ঝিন্দন এই ধূমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই। বরং নানা প্রকারে উহার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ঝিন্দনের চরিত্রের এই অংশ নিতান্ত ক্ষীণ, ও নিতান্ত দুর্ব্বল। এই ক্ষীণতা ও এই দুর্ব্বলতা, ঝিন্দনের অবলাপ্রকৃতির দোষ। ঝিন্দন লাল সিংহের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতেন, এবং তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন; অনুগ্রহ ও ভালবাসার পাত্রের দোষ ঝিন্দনের চক্ষে দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, ঝিন্দনের এই দোষ অবলাহৃদয়ের দোষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব।

রণজিতের মৃত্যুর পর খালসা সৈন্যের যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া ইংরেজগণ আপনাদের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এজন্য বহুসংখ্য সৈন্য ব্রিটিশ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই উদ্‌যোগ দেখিয়া খালসাদিগের হৃদয়ে নানাপ্রকার আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল। ঝিন্দনও শঙ্কিত হইলেন। তিনি সীমান্তভাগে ইংরেজদিগের সৈন্যশৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সীমায় যেরূপ আটঘাট বাঁধিতেছেন, তাহাতে হঠাৎ পঞ্জাব রাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে। পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া তাঁহার এই ভাবনার সহায় হইল। ঝিন্দন ভাবিলেন, ইংরেজগণ এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্যসমূহে পরাধীনতার নিগড় পরাইয়া দিয়াছেন। এই কৌশলের বলেই মহারাষ্ট্রীয়গণ দীর্ঘকাল হস্তসঞ্চালন, পদসঞ্চালন, পদবিক্ষেপণ ও শোণিতমোক্ষণের পর, বিকট শ্মশানে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মুসলমান যোগরত তপস্বীর ন্যায় ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া আপনার পূর্ব্বগৌরবের ধ্যান করিতেছে। এইরূপ চিন্তায় অধীর হওয়াতেই ঝিন্দন প্রথম শিখযুদ্ধানলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত হস্তীর ন্যায় শতদ্রু পার হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কাতেই ঝিন্দন তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে ঝিন্দনের যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ঝিন্দন এ বিষয়ে যদি তাঁহার দূরদর্শী পতির অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিতেন, তাহা

হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষিত হইত।

লালসিংহ ও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম শিখযুদ্ধে খালসাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গেই এক প্রকার ব্রিটিশসিংহের করায়ত্ত হইলেন। সুতরাং প্রথম শিখযুদ্ধের পর হইতেই ঝিন্দনের অদৃষ্টচক্র নিম্নে যাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ঝিন্দনের হৃদয় ব্রিটিশসিংহের দুর্নিবার তেজের নিকট পরাভূত হইল না। ঝিন্দন পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পর জাতি "সাত সমুদ্র, তের নদী" পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। বিদেশীর এই স্পর্দ্ধা, এই অনধিকারপ্রিয়তায় ঝিন্দন মর্ম্মে আঘাত পাইলেন।

রেসিডেণ্ট স্যার হেন্‌রি লরেন্স ঝিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। এই তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে, আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে না, ইহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেণ্ট ঝিন্দনকে লাহোর হইতে শেখপুরনামক স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন। এ স্থানেও ঝিন্দন দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেডরিক্ কারির মন্ত্রণায় ঝিন্দন শেখপুর হইতে আবার বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপ নির্ব্বাসনেও ঝিন্দনের কিছুমাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, ঝিন্দন অটলভাবেও অবিকারচিত্তে স্বকীয় দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন

করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঝিন্দন এক সময়ে লাহোরে থাকিয়া, চারি দিকে আপনার ক্ষমতা বিকাশ করিয়াছিলেন, লাহোরের অমাত্যসমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকটে অবনতমস্তক ছিলেন; লাহোর পরিত্যাগ সময়ে ঝিন্দনের যেরূপ স্থিরতা দেখা গিয়াছিল, পঞ্জাবপরিত্যাগের সময়েও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। যে পঞ্জাব এত কাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিতেছিল, এখন সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্রবিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ঝিন্দন স্থিরহৃদয়ে পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। বৈদেশিকের নিকটে ঝিন্দনের চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া ঝিন্দনের চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই স্থিরতার জন্য নারীসমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিতা হইবেন।

এই নির্ব্বাসনঘটনাতেই ঝিন্দনের সৌভাগ্য চির দিনের জন্য অন্তর্হিত হয়; ইহার পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহ কাণ্ড শিখযুদ্ধ। দ্বিতীয়বারের শিখযুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয়বারের শিখযুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্যনেমির শেষ আবর্ত্ত। সাগরের দুটি প্রবল জলোচ্ছ্বাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ আসিয়া পরস্পরের সঙ্ঘর্ষে ভীষণভাবের উৎপত্তি করে, এবং বহু ক্ষণ ঘাতপ্রতিঘাতের পর ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া যায়; শিখযুদ্ধেও সেইরূপ

দুইটি প্রবল জাতি বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া বহু ক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইষ্টকের উপর ইষ্টক গ্রথিত করিয়া, যে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়াছে। অপর দিকে শিখযুদ্ধ শিখদিগের বীর্য্যবহ্নির অসাধারণ বিস্ফুরণ স্থল। গুরু গোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণতন্ত্রসমাজে একত্র করিয়াছিলেন, শিখযুদ্ধেই তাহার উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। যে চিনিয়াবালার নাম ভারতের ইতিহাসে অঙ্কিত রহিয়াছে,যে চিনিয়াবালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছে, শিখযুদ্ধে সেই চিনিয়াবালা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস যাহাই বলুক না কেন, আমরা ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকেই এই ঘটনার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। অনেকে বলিতে পরেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনসময়ে পঞ্জাবে বিরাগের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রুপাত, হাহাকার, শিরে করাঘাত করিয়া, এই নির্ব্বাসনসংবাদ চারি দিকে ঘুষিয়া বেড়ায় নাই। পঞ্জাব নিবাত, নিষ্কম্প জলধির ন্যায় ধীর ভাবে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে; সুতরাং ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকে শিখ জাতির সমুত্থান ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধসঙ্ঘটনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহারা শিখদিগের মনোগতভাবের উন্নয়নে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে; কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে হইবে যে, তাঁহারা যাহাকে আহ্লা-

দের চিহ্ন মনে করেন, আমরা তাহাকেই বিষম মর্ম্মপীড়ার নিদর্শন মনে করি, এবং তাঁহারা যাহাতে সুখ ও শান্তি দেখিয়া সুখী হয়েন, আমরা তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনোবেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না, তাহা সামান্য বাহ্যবিকারের সহিতই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই দুঃখ দুঃখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র। যখন দেখিব, কেহ দুঃখে অধীর হইয়া দুই হস্তে মস্তকের কেশ উৎপাটন করিতেছে; বিকটস্বরে রোদন করিয়া চারি দিকের জনতা বৃদ্ধি করিতেছে; তখন সদয়-ভাবে তাহাকে দুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব; কিন্তু যখন দেখিব, কেহ কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে ম্রিয়মাণ হইয়া অচঞ্চল সাগরের ন্যায় ধীরভাবে বসিয়া আছে; মস্তকের এক গাছি কেশও নড়িতেছে না, এক বিন্দু অশ্রুও নেত্র হইতে গলিয়া পড়িতেছে না, হৃদয়ে প্রজ্বলিত হুতাশন ধক্ ধক্ করিতেছে, কোন বাহ্যভঙ্গীর সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসি-তেছে না, পরমাত্মসংযত, ধ্যানস্তিমিতনেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশব্দে ও নিস্পন্দভাবে সে আপনার জ্বালায় আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে, তখন তাহাকে কাতরভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়াই নিদর্শন করিব। “অল্প দুঃখ নেত্রবারির সহিতই বিগলিত হয়, অল্প ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চন ও দন্তঘর্ষণের সহিতই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, অল্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বিলয় পায়।” কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত হয়; যে ক্রোধ শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে; যে আশঙ্কা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া, নিরন্তর অস্থিরতার

উৎপত্তি করিতে থাকে, তাহা কখনও ভ্রূকুঞ্চন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। ঝিন্দনের নির্ব্বাসনসময়ে পঞ্জাবের যে, নিশ্চলভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কামূলক। পঞ্জাবের এই নিস্তব্ধতা শান্তির নিস্তব্ধতা নহে; ইহা গভীর দুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কার নিস্তব্ধতা। এই দুঃখ, ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কায় শিখযুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহের মহিমাবলে পঞ্জাবের অন্তর্নিগূঢ় তুষানল এই যুদ্ধের সময়েই প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইয়া, বিষম স্ফুলিঙ্গক্রীড়া প্রদর্শন করে। যে বীরশ্রেষ্ঠ চিনিয়াবালায় বিজয়পতাকায় শোভিত হইয়াছিলেন, তিনি ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে মর্ম্মাহত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, "ইহা সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমগ্র পঞ্জাববাসী, সমগ্র শিখ, সংক্ষেপে সমগ্র পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গীগণ পরলোকসুখভোগী রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাত্ম্যে এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ, তাহারা সমগ্র প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারাবদ্ধ ও হিন্দুস্তানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতে ত্রুটি করে নাই; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এত দূর নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ আমাদের রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।" ইহাতেও কি বলিব ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয় নাই? ইহাতেও কি বলিব, পঞ্জাব নিরুদ্বেগে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে?

ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে কেন পঞ্জাব এইরূপ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ

হইল ? কেন পঞ্জাবের প্রতি রোমকূপে ক্রোধের অনলকণা প্রবিষ্ট হইল ? কেন পঞ্জাবের প্রতি শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল ? ইহার একই উত্তর, ঝিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রের শোচনীয় দশা কখনও শান্তভাবে চাহিয়া দেখা যায় না। পঞ্জাব যাঁহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, মাতার ন্যায় সরলহৃদয়ে ভালবাসিত, তাঁহার নির্ব্বাসনে যে, পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হলাহলে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রকে আমরা কোন্ প্রাণে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিব ? যাঁহারা ইহা দেখিয়াও ঝিন্দনকে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা মানবজাতির শত্রু। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ভক্তির অবমাননা করেন, শ্রদ্ধার মুলোচ্ছেদ করেন, এবং ভালবাসার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও রূপ সমবেদনা নাই।

এই উজ্জ্বলতায় ঝিন্দনের সমস্ত ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঝিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল। তিনি লাবণ্যময়ী হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আস্পদ ছিলেন; কোমলতাময় অঙ্গনাহৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও, ধীরতার অবলম্বন ছিলেন; এবং কমনীয় সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াও, তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঝিন্দনের প্রকৃতিতে দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাতে যে সকল গুণ আছে, তাহার জন্য তাঁহার আদর না করা মূঢ়ের কর্ম্ম। দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং গুণকে সকল

স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কোনও বিশ্বশত্রু পাষণ্ডের কোন অলোকসাধারণ গুণ দেখিলে তাহার পাষণ্ডত্ব ক্ষণকাল বিস্মৃত হইয়া, তদীয় লোকাতীত গুণের পূজা করা উচিত। যখন দেখিতেছি, এক জন নির্দ্দয় দস্যু এক দিকে মূর্ত্তিমান্ পাপের ন্যায় সকলের হৃদয়বৃন্ত ছিন্ন করিয়া সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করিতেছে, অপর দিকে অপরিসীম ও পবিত্র ভক্তির সহিত মাতার পদসেবায় ব্যাপৃত হইতেছে এবং অপরিসীম প্রেমের সহিত বনিতার মনোরঞ্জন করিতেছে, তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্যপ্রেমের নিকটে সহজেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতেছি, এক জন নিষ্ঠুর দুরাশয় এক সময়ে এক জন নির্দ্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনার দুরাশয়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আবার পবিত্রভাবে সংযতচিত্তে স্নান করিয়া, স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন, ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে নয়নজল ভাগীরথীর জলপ্রবাহের সহিত মিশাইয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে নিস্পন্দ ভাবে পরম দেবতার আরাধনা করিতেছে, তখন আপনা হইতেই তাহার দেবভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নিষ্ঠুরগণও যখন সময়বিশেষে হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন ঝিন্দন এক জনের প্রতি অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা এক জনকে অধিক মাত্রায় ভালবাসিতেন বলিয়াই যে, অপ্রীতির পাত্রী হইবেন, হৃদয় থাকিতে আমরা তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা ঝিন্দনকে আজীবন দয়ার চক্ষেই দেখিব, আজীবন ঝিন্দনের চরিত্র ভাল ভাবেই স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিব। বৈদেশিক

গণ যেরূপে অসহায় ভারতের একটি অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালিমা বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিব, এবং চিরকাল সেই চিত্রের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা দেখাইব।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব, এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়ে অনেক বিচিত্র ঘটনা রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুগণ পঞ্জাবে বাস করিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রথমে হিমালয় হইতে দক্ষিণাপথের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। ভারতের হিন্দু অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসের একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই অধিকারে সভ্যতার উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়, এবং বিদ্যার বহুল-প্রচার হইয়া উঠে। গ্রীক পণ্ডিত আরিস্ততল যাহাতে পরাস্ত হইয়াছেন; পিথাগোরস্ যাহাতে বিমুখ হইয়াছেন; জিনদোতস্ যাহাতে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন; বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের প্রতিভাবলে তাহা পরিষ্কৃত ও সুবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাষ্প-রাশি যেমন আপনা হইতেই শূন্যে প্রসারিত হয়; জলস্রোত

যেমন আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়; বহ্নিশিখা যেমন আপনা হইতেই আকাশের দিকে সমুত্থিত হয়; হিন্দুদিগের মন তেমনি আপনা হইতেই শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাসে আসক্ত হইয়া উঠে। এই আদিম সভ্যতাস্রোতে নীয়মান হইয়া হিন্দুগণ জলদগম্ভীর মধুরস্বরে বেদ গান করিয়াছেন; উপনিষদের গূঢ় অর্থ বিবৃত করিয়া ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্তবিমোহিনী কবিত্ব-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, এবং গণিতের অদ্ভুত সঙ্কেত প্রচার করিয়া পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের উন্নতির প্রসূতি।

ইহার পর বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যাহা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া তুলে। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মবীজ। হিংসা হিন্দুদিগের যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রধান সাধন, অহিংসা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্র সোপান। মায়াময় সংসারপাশ হইতে বিমুক্তি অথবা স্বর্গলাভ হিন্দুদিগের অন্তিম সিদ্ধি, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্মের সংঘাতে হিন্দুধর্ম্ম প্রথমতঃ পরাজয় স্বীকার করে। সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস যেমন ক্ষীণ শক্তি মানবের নিষেধ না মানিয়া, প্রবলপরাক্রমে সমুদয় দেশ ভাসাইয়া দেয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সেইরূপ দুর্ব্বারবেগে হিন্দুধর্ম্মকে দলিত করিয়া সমস্ত স্থানে ব্যাপিয়া পড়ে। ক্রমে কামস্কট্‌কার তুষারধবল ভূখণ্ড হইতে চীন পর্য্যন্ত এবং ভারতের সিন্ধুপরিক্ষালিত স্বর্ণভূমি হইতে বালী ও যব দ্বীপ পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য

প্রসারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের সময়ে বৌদ্ধ রাজগণের প্রবল প্রতাপও ইতিহাসের বর্ণনীয় হইয়া উঠে। মগধ সাম্রাজ্যের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়; মহারাজ অশোকের শাসনমহিমা গ্রীক ও রোমক রাজগণের নিকটে পরাভব না মানিয়া, গৌরব ও সৌভাগ্যলক্ষ্মীর স্পর্দ্ধা করে।

কালের পরাক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার হিন্দুধর্ম্মের নিকটে মস্তক অবনত করিল। ব্রাহ্মণগণ আবার শ্রমণগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন, এবং বৌদ্ধ রাজগণের পরিবর্ত্তে আবার হিন্দুরাজগণের স্তুতিগীতিতে ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। কিছু কালের মধ্যেই মগধ সাম্রাজ্য ও মগধ রাজগণের প্রতাপ ক্ষণস্ফূর্ত্তিমান্ জলবিম্বের ন্যায় সময়ের অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া গেল, এবং তাহার স্থানে উজ্জয়িনী-রাজত্বার খরতর তরঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। এই তরঙ্গ কেবল নির্দ্দিষ্ট সীমাতেই আস্ফালন করিল না। ইহার আবেগ কেবল সঙ্কীর্ণ সীমাতেই সঙ্কুচিত রহিল না। ইহা সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়া, ক্রমে ভিন্ন দেশের উপকূলে আঘাত আরম্ভ করিল। হিন্দুগণ এখন শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত না থাকিয়া, চারি দিকে আপনাদের ক্ষমতা ও প্রভুতা বিস্তার করিলেন। ইহারা শকদিগকে পরাজিত এবং রণ-কুশল ব্যক্তিদিগকে আপনাদের সংরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের এইরূপ পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতে উহার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই একটি তরঙ্গ ইতস্ততঃ তটাভিঘাত করিয়া বেড়াইতেছিল। যে প্রজ্জ্ব-

লিত হুতাশন কপিলবস্তু হইতে সমুত্থিত হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিল, তাহা তখনও স্থিররশ্মি দীপমালার ন্যায় দুই একটি স্থানে আলোক প্রদান করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ বহু চেষ্টা করিয়াও, ঐ তরঙ্গ অচঞ্চল বারিরাশির সহিত মিশাইতে পারিলেন না, এবং বহু সাধনা করিয়াও, এই আলোকের নির্ব্বাণে সমর্থ হইলেন না। উজ্জয়িনীশোভিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুমের সৌরভ যখন চারি দিক আমোদিত করিয়া তুলে, পুরুষসিংহ ভোজের শাসনমহিমা যখন আর্য্যাবর্ত্তকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহিত করে, এবং শাস্ত্রদর্শী চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ানের গবেষণা যখন অবাধে হিমালয়ের তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়, তখন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় শ্রমণগণও আপনাদের ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং হিন্দু নৃপতির ন্যায় বৌদ্ধ নৃপতিও কোন কোন স্থানে আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, এইরূপে বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন নরপতির শাসনে থাকিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। মধ্যে দক্ষিণাপথের এক জন নাম্বুরীজাতীয় ব্রাহ্মণ অদ্ভুত বিচারশক্তি, অদ্ভুতলিপিকুশলতা ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়া, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েন। ভারতবর্ষ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার লোকাতীত জ্ঞানের নিকটে মস্তক অবনত করে, এবং কেহ কেহ তাঁহার তেজোমহিমাদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ত্রিলোকগুরু ভবানী-পতির অবতার বলিয়া তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলে।

ষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভ হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের

অভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ। ইহার পর প্রবল পরাক্রান্ত একটি বিধর্ম্মী জাতি সাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভারতে আসিয়া, সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহু পূর্ব্বে পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই। বাহ্লীকের গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই। আরবগণও এক বার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া, সিন্ধুক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমের হত্যার পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত রহে নাই। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে যে দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার সারহীন হইয়া পড়ে। সুলতান মহমূদ দ্বাদশ বার ভারত-বর্ষে আসিয়া অনেক জনপদ উৎসন্ন করেন। ভারতের অতুল্য সম্পত্তি দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। মথুরার প্রাসাদের আদর্শে গজনি নগর সুশোভিত হয়। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুণ্ঠনেই আসক্ত ছিলেন, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তত যত্ন করেন নাই। কিন্তু মহম্মদ গোরী মধ্য এসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া, সুলতান মহমূদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যগণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; যত ক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, তত ক্ষণ তাঁহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসল-মানের চাতুরীপ্রভাবে অথবা নিয়তির অনন্ত শক্তিতে তাঁহাদের পরাজয় হইল। দৃষদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিয়া গেল।

মহম্মদ গোরী বিজয়ী হইয়া, আপনার প্রিয়পাত্র কোতোবদ্দীন ইবক্‌কে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া গেলেন। কোতোব হইতে ভারতে মুসলমানের আধিপত্যের আরম্ভ হইল। ক্রমে ভারতের এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল; ক্রমে এক বংশের পর আর এক বংশ দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠিল। এই নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। রামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, বৈষ্ণব মত প্রচার করিলেন; রামানন্দ; ও গোরক্ষনাথ, রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে যত্নবান্ হইলেন; কবীর বেদ ও কোরাণের অনুশাসন না মানিয়া, ঐশ্বরিক তত্ত্বের ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছুকাল পরে নদিয়ার এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবক প্রেমের অমৃতপ্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেমপ্লাবনে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সময়ে ইউরোপে মহামতি লুথর প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর এক জন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্ম্মজগতে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, যে সময়ে তাঁহার প্রতিভাবলে আর একটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর তটে হিন্দুদিগের বিজয়বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে যে নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহার সংস্রবে

এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। এই জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিল, এবং ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। ইহারা সাহস ও রণদক্ষতায় ক্ষত্রিয়স্পর্দ্ধী হইয়া, লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক সকলকে আপনাদের ধর্ম্মে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইয়া উঠিল। ইহাদের মোল্লা, ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, এবং হিন্দুদিগের ভক্তি, ঈশ্বর-প্রীতি ও জাতিবিচার, সমস্ত বিষয়েই উপেক্ষা করিয়া, কোরাণের মাহাত্ম্যপ্রচারে উদ্যত হইলেন। ক্রমে কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল; পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ, ইহার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না করিয়া, নূতনের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধর্ম্মবিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। নানাবিধ কুসংস্কারে রোমনগর যখন ভারাক্রান্ত হয়, এবং রোমের ধর্ম্মমত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ ঐ সময়ে আপনাদের অন্তঃ-

প্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন, ধ্যানাদি কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না। লোকে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া, অন্য কোন নূতন উপাসনাপদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। নানামতের ঘাতপ্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে খ্রিষ্টীয়ধর্ম্মতত্ত্ব ক্রমে রোমকদিগের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে লাগিল, এবং প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া পরিশেষে জুপিতর-দেবের ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিল। ভারতবর্ষও ঐরূপ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান-ধর্ম্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নানকের পূর্ব্বে রামানন্দ প্রভৃতি কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবর্ষের স্থলবিশেষে আধিপত্য বিস্তার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামানন্দের প্রাচুর্ভাব হয়। রামানন্দ ধর্ম্মবিষয়ে নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা তাঁহার প্রধান নীতি ছিল। তিনি জাতিভেদের উচ্ছেদ করিয়া সকলকেই সমভাবে আপনার সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে তাঁতি, চামার, রাজপুত ও জাঠ, সকলেই এক শ্রেণীতে নিবেশিত ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া উঠিল। রামানন্দের সমকালে গোরক্ষনাথ নামক আর এক ব্যক্তি পঞ্জাবে যোগের মাহাত্ম্যঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন. এবং মহাদেবকে আরাধ্য দেবতা করিয়া তাঁহার উপাসনায়

প্রবৃত্ত হয়েন। ইহার পর কবীরের আবির্ভাব। কবীর ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া, ধর্ম্মমতের আর এক শ্রেণী উপরে আরোহণ করেন। রামানন্দ জাতিভেদ রহিত করিয়াও, যে বাহ্য আড়ম্বরের চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, কবীর সে চিহ্নেরও উচ্ছেদ করিলেন। তাঁহার মতে বাহ্য আড়ম্বর নিস্ফল, কেবল অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন। তিনি সমুদয় দেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল বিষ্ণুর উপাসনায় সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইহার পর চৈতন্যের অমৃতময় প্রেমের মোহিনী শক্তিতে ভারতবর্ষ বিমোহিত হয়। চৈতন্য জাতিগত পার্থক্য রহিত করিয়া, ভক্তি ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, নির্জ্জীব ভারতে জীবনী শক্তি সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে তৈলঙ্গদেশের বল্লভাচার্য্যনামক এক জন ব্রাহ্মণের উৎসাহে আবার একটি নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। বল্লভাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন নাই, নির্জ্জন বনে কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। তাঁহার মতে যাবতীয় সুখসেব্য বিষয় ভোগ করিয়া, ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বল্লভাচার্য্য এইরূপে ভোগবিলাসের অনুমোদন করিয়া, শ্যামসুন্দর গোপালের উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্মপদ্ধতির দিকে উন্মুখ হয়। হিন্দুগণ শান্তিলাভের আশায় নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কারচেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হয়েন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সংযোজিত

করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটি নূতন রেখাপাত করিয়া দেন। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে, ঘর্ষণেপ্রতিঘর্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া পড়ে। উল্লিখিত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ কোন কোন অংশে ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে. কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতাকে অধিষ্ঠাত্রী করিয়া, তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। রামানন্দের রামসীতা,গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষ্ণু, চৈতন্যের হরি, বল্লভাচার্য্যের গোপাল, ইঁহারা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে সম্পূজিত হয়েন। এই সকল সাম্প্রদায়িক মত ব্যতীত নানকের প্রতিভাগুণে আর একটি ধর্ম্মমতের প্রচার হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীরের পর নানক সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়া, আপনার মত প্রকাশ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ শিখ নামে প্রসিদ্ধ হয়। শিখগণ পরিশেষে সাহসে ও বীরত্বে ইতিহাসের বরণীয় হইয়া উঠে। গুরু গোবিন্দ সিংহ এই ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া, ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, এবং সকলের শিরায় শিরায় অনির্ব্বচনীয় উৎসাহশক্তি তাড়িতবেগে সঞ্চারিত করিয়া দেন।



জগৎ শেঠ

অনেকের বিশ্বাস, জগৎ শেঠ এক জন লোকের নাম। পাঠশালার বালকেরা জগৎ শেঠকে একটি লোক বলিয়াই জানে। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা হয় না, তাই এইরূপ দুই একটি ভ্রম থাকিয়া যায়। জগৎ শেঠ কোন মানুষের নাম নহে। ইহা একটি উপাধি মাত্র। শ্রেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশে বোধ হয়, শেঠ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী বৈশ্যদিগের উপাধি। হিন্দু রাজাদিগের অধিকারকালে বৈশ্যেরা ধনরক্ষকের কর্ম্ম করিতেন। অসময়ে তাঁহারা রাজাকে টাকা ধার দিতেন। মুসলমান নবাবদের অধিকারসময়ে সেই শেঠেরা ধনরক্ষক হয়েন, এবং সময়ে অসময়ে টাকা ধার দিয়া নবাবের সাহায্য করেন। এই সময়ে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা। ধনে, মানে, খ্যাতিতে ইঁহারা ভারতবর্ষের অনেক জমীদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, "শেঠদিগের কারবার ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ন্যায় বিস্তৃত।" ইহা অত্যুক্তি নহে। শেঠগণ ভারতবর্ষে ধনকুবেরের ন্যায় ছিলেন। এ সময়ে ইঁহারা আপনাদের ক্ষমতাবলে দিল্লীর দরবারেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অর্থ, ইঁহাদের ক্ষমতা, ইঁহাদের মন্ত্রশক্তি অনেক সময়ে দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক প্রধান ঘটনার সহিত শেঠদিগের সংশ্রব আছে। শেঠগণ এক সময়ে বাঙ্গালার নবাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে সেই নবাবের বিরুদ্ধেই উঠিয়া, তাঁহাকে হতমান ও হতসর্ব্বস্ব করিয়া, শ্বেত পুরুষকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

যে শেঠবংশের কথা বলা যাইতেছে, তাহা দুই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। মাড়বারীগণ শেঠদিগের মূল। শেঠগণ শ্বেতাম্বরীয় জৈন সম্প্রদায়-ভুক্ত। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর ইঁহাদের আদি বাসস্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইঁহাদের আদিপুরুষ হীরানন্দ শাহ অর্থোপার্জ্জন মানসে পাটনায় আসিয়া বাস করেন। হীরানন্দের সাত পুত্র। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে আপনাদের কারবার চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম মাণিকচাঁদ। ইনি ঢাকায় গিয়া বাস করেন। শেঠগণ এই মাণিকচাঁদকেই বাঙ্গালায় আপনাদের বংশের স্থাপনকর্ত্তা বলেন। ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী, এবং বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। মাণিকচাঁদ এই খানে আপনার ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে মুর্ষিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। মাণিকচাঁদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই মুর্ষিদ কুলির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৭০৪ অব্দে মুর্ষিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্ষিদাবাদে যাইয়া, রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিকচাঁদ মুর্ষিদাবাদে গমন করন। এই খানে তাঁহার ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়েন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। বাঙ্গালার যে সমস্ত জমীদার ও তহশীলদার নবাব সরকারে রাজস্ব দিতেন, তাঁহাদের সকলকেই মাণিকচাঁদের হাতে টাকা দিতে হইত। ইহা ব্যতীত দিল্লীতে প্রতিবৎসর যে দেড় কোটী টাকা রাজস্ব দিতে হইত, তাহাও মাণিকচাঁদের হাত দিয়া যাইত। নবাব অনেক সময়ে নিজের টাকাকড়ি

মাণিকচাঁদের ধনাগারে জমা রাখিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফররোখ্ সয়েরকে অনুরোধ করিয়া ১৭১৫ অব্দে মাণিক-চাঁদকে "শেঠ" উপাধি দেন। মাণিকচাঁদ উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। শেঠ বংশাবলীর কাগজপত্রে উল্লিখিত আছে, মাণিকচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় নবাবী পদ রক্ষা করিবার জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁর সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সময় হইতে মাণিকচাঁদ ও তাঁহার সন্তানগণ মুর্শিদাবাদের শাসনসমিতির প্রধান সভ্য হয়েন। শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়েই ইঁহাদের আধিপত্য থাকে। ইঁহারা অনেক সময়ে দিল্লীর দরবারে প্রধান প্রধান ওমরাহকে পত্র লিখিয়া, আপনাদের মতামত নির্দ্দেশ করিতে থাকেন।

মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার ফতেচাঁদ নামক একটি ভ্রাতৃপুত্রকে তিনি দত্তকপুত্র করেন। ফতেচাঁদও "শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সম্রাট্ ফর্রোখ্ সয়ের ইঁহাকে বড় ভালবাসি-তেন। ১৭২২ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। ফতেচাঁদ তাঁহার পদ অধিকার করেন। কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অব্দে ফতেচাঁদ যখন দিল্লীতে উপস্থিত হয়েন, তখন সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধি দান করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, ফতেচাঁদ ফর্রোখ্ সয়েরের নিকট এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। যাহা হউক, ফতেচাঁদই যে, সকলের আগে "জগৎ শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেকেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ফতেচাঁদের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং দিল্লীর দরবারে বড় সুখ্যাতি ছিল। কোন সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবী ফতেচাঁদকে দিবার কথা হয়; কিন্তু

মুর্ষিদ কুলি খাঁ শেঠবংশের সহায় ছিলেন, এ জন্য ফতেচাঁদ এই পদ গ্রহণ করেন নাই; বরং সম্রাটের সহিত নবাবের মিল করিয়া দিয়া, উপকারীর প্রত্যুপকার করেন। এ বিষয়ে দিল্লী হইতে যে ফর্ম্মান প্রচার হয়, তাহাতে লেখা ছিল, "ফতেচাঁদের বিশেষ চেষ্টায় ও প্রার্থনায় বাঙ্গালার নবাব দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইলেন।" নবাব শাসনসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে ফতেচাঁদের পরামর্শ লইতেন; এই সময় হইতে ফতেচাঁদের সন্তানগণ দিল্লীর দরবারে প্রসিদ্ধ হয়েন। বাঙ্গালার নবাবকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া আবশ্যক হইলে, সেই সঙ্গে জগৎ শেঠকেও খেলাত দেওয়া হইত। বাদশাহের নিকটে ফতেচাঁদ মণিখচিত একটি উৎকৃষ্ট মোহর উপহার প্রাপ্ত হয়েন। উহাতে "জগৎ শেঠ" উপাধি ক্ষোদিত ছিল। শেঠবংশীয়গণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই মোহরটি যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন।

মুর্ষিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হয়েন। ফতেচাঁদ সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রিসভার চারি জন সভ্যের মধ্যে এক জন সভ্য ছিলেন। এই নবাব, ফতেচাঁদের পরামর্শ অনুসারে, চৌদ্দ বৎসর বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও ফতেচাঁদ মন্ত্রিসভার সভ্যের পদ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু শেষে সরফরাজের ইন্দ্রিয়পরতা ও যথেচ্ছাচারে ফতেচাঁদ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। ইহিহাসলেখক অর্ম্ম সাহেব কহেন, ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ পরমসুন্দরী ছিলেন। নবাব তাঁহার রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ফতেচাঁদ নবাবকে এই অনুচিত কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন, আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা

রক্ষা করিবার জন্য নবাবকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। দুরাচার নবাব অবলীলাক্রমে, অসঙ্কুচিতভাবে রাজ্যের এক জন প্রধান ব্যক্তির কথায় উপেক্ষা করিয়া, আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। ফতেচাঁদ নিরুপায় হইলেন। যুবতী পুত্রবধূকে নবাবের গৃহে পাঠান হইল; নবাব কিয়ৎক্ষণমাত্র নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিলেন। যুবতী অকলঙ্কিতশরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় ফতেচাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। অসূর্য্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরবাসিনী বধূ পরধর্ম্মাক্রান্ত পর-পুরুষের মুখ দেখাতে ফতেচাঁদ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান, এ ক্ষোভ তিনি আর ভুলিতে পারিলেন না। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ফতেচাঁদ আপনার বংশের মঙ্গলবিধাতা মুর্ষিদ কুলি খাঁর বংশধরের পক্ষ ছাড়িয়া, আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত মিশিলেন।

কিন্তু শেঠবংশীয়গণ এই ঘটনাটি আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, মুর্ষিদ কুলি খাঁ মাণিকচাঁদের নিকটে সাত কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই টাকা আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার পর সরফরাজ খাঁ এই টাকার জন্য ফতেচাঁদকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি নবাবকে কিছু কাল অপেক্ষা করিতে কহেন; এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ, বিহারে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদ এই অবসরে তাঁহার সহিত মিশেন। এই বিদ্রোহের ফল বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। গড়িয়ার যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হয়েন। আলিবর্দ্দী, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

১৭৪৪ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুইটি পুত্র, পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই, এক একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া, পরলোকগত হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ পৌত্রের নাম স্বরূপচাঁদ। মহাতাব রায় "জগৎ শেঠ" এবং স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" উপাধি পাইয়া, দুই জনেই একত্র আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শেঠ-দিগের বাণিজ্যলক্ষ্মীর বড় উন্নতি হয়। কথিত আছে, তাঁহাদের মুলধন ক্রমে দশ কোটী টাকা হইয়া উঠে। ১৭৪২ অব্দে মরাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মুর্ষিদাবাদ লুঠিয়া লন। ইহাতে শেঠ দিগের আড়াই কোটী টাকা অপহৃত হয়। মুসলমান ইতিহাস-লেখক, সয়ের মুতাক্ষরীণপ্রণেতা গোলাম হোসেন কহিয়াছেন, শেঠগণ এক কোটী টাকার বিল দেখিবা মাত্র টাকা দিতে পারি-তেন। প্রবাদ আছে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে টাকা সাজাইয়া স্মুতির নিকটে ভাগীরথীর মুখ বুজাইয়া ফেলিতে পারিতেন। নবা-বের শাসনসময়ে টাকা রাখিবার জন্য দেশের সকল স্থানে ক্ষুদ্র ধনাগার ছিল না। জমীদারগণ রাজস্ব আদায় করিয়া, মুর্ষিদা-বাদের ধনাগারে জমা করিয়া দিতেন। মুর্ষিদ কুলি খাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজস্বঘটিত বার্ষিক বন্দোবস্তের সময়ে সকল জমীদারকেই আপনাদের হিসাবাদি পরিষ্কার করিবার জন্য মুর্ষি-দাবাদে শেঠদিগের নিকটে আসিতে হইত। এ সম্বন্ধে বার্টসন সাহেব ১৭৬০ অব্দে যে বিবরণ লিখেন, তাহাতে জানা যায়, জগৎ শেঠ শত করা অর্দ্ধমুদ্রা দিয়া, মুর্ষিদাবাদের টাকশালা হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন কাশীমবাজারের কুঠি আক্রমণ

করেন, তখন ইংরেজেরা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান। এই টাকা শেঠদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

১৭৫৩ অব্দে বিলাতের ডিরেক্টর সভা কলিকাতার কৌন্সিলের অধ্যক্ষকে কলিকাতায় একটি টাকশালা স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কৌন্সিলের অধ্যক্ষ শেঠদিগের ধনবাহুল্যের উল্লেখ করিয়া, এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হয়েন। এ সম্বন্ধে তিনি ডিরেক্টরদিগকে স্পষ্টাক্ষরে লিখেন, "আমরা নবাবকে যত টাকা দিব, জগৎ শেঠ তাহা অপেক্ষা অনেক টাকা দিয়া, নবাবকে বশীভূত করিবেন। সুতরাং নবাবের নিকটে টাকশালাস্থাপনের অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা নাই।" ইহার পর ডিরেক্টর সভার অধ্যক্ষ কলিকাতার কৌন্সিলকে জগৎ শেঠের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে দিল্লীর দরবার হইতে অনুমতি আনিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, ১৭৫৭ অব্দে ইংরেজেরা কলিকাতার টাকশালা স্থাপন করেন। কিন্তু জগৎ শেঠের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই। ডগলাস্ নমক এক জন সমৃদ্ধিপন্ন ব্যবসায়ীর সহিত কোম্পানির টাকা লেনাদেনা ছিল। কলিকাতায় টাকশালা হওয়ার এক বৎসর পরে ডগলাস ইংরেজদিগের মুদ্রিত টাকা লইয়া কারবার চালাইতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "জগৎ শেঠ মুর্ষিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে কম করিয়া, আপনার কারবার চালাইবেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইংরেজদিগের মুদ্রিত সিক্কা টাকার মুল্য কম করিতে পারেন না।" শেঠেরা কেমন সমৃদ্ধিপন্ন ও কেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

১৭৫৬ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরেজদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অবরোধ করিলে শেঠেরাই প্রধানতঃ নবাবের সহিত ইংরেজদের সৌহৃদ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন। ইংরেজেরা যে সময়ে নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া, কলিকাতা হইতে পলাইয়া পল্‌তার নিকটে উপস্থিত হয়েন, এবং জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গূঢ় মন্ত্রণা করেন, সেই সময়ে শেঠদিগের সহিত ইংরেজদিগের বিশিষ্ট সংশ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ২২ শে জুন কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হয়। ২২ শে আগষ্ট কলিকাতার কৌন্সিল, নবাবের সহিত সম্মিলনের অভিপ্রায়ে জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিবার প্রস্তাব করেন।

মীরজাফর প্রভৃতি সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতিগণ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগৎ শেঠের অসদ্ভাব জন্মে। "কথিত আছে, জগৎ শেঠ স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দিল্লী হইতে সনন্দ আনিয়া নবাবকে দেন নাই, এই তাঁহার এক অপরাধ। তাঁহার আর এক অপরাধ, নবাব তাঁহাকে বণিক্‌দিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন, কিন্তু জগৎ শেঠ মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে," এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। এই কথা শুনিয়া নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, এবং তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মীরজাফর এই সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; শীঘ্র পূর্ণিয়া হইতে মুর্শিদাবাদে আসিলেন, এবং জগৎ শেঠকে কারামুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত

নবাবকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নবাব এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। জগৎ শেঠ কারাগৃহে অবরুদ্ধ রহিলেন। অতঃপর সিরাজের অদৃষ্টচক্র অধোগামী হইবার সূত্রপাত হইল।

অপমানিত হইয়া মহাতাঁব রায় ইংরেজদের সহিত মিশিয়া সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৫৬ অব্দের ২৩শে নবেম্বর কৌন্সিলের সভ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় পল্‌তাতেই থাকিয়া গোপনে চক্রান্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনুরোধে মেজর কিলপাট্রিক্ জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, 'ইংরেজরা সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য কেবল জগৎ শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন।' প্রকাশ পাইলে পাছে নবাব তাঁহাদিগকে শাস্তি দেন, এই আশঙ্কায় শেঠেরা প্রকাশ্যভাবে কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রণজিত রায়কে কর্ণেল ক্লাইবের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি দিলেন। ১৭৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের যে সন্ধিপত্র অনুসারে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা রণজিৎ রায়ের উদ্‌যোগে সম্পন্ন হয়।

ইহার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। নবাবের সহিত ইংরেজদের আবার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই সময়ে শেঠেরা ইংরেজদিগের সবিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহে সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে ইংরেজের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা ইংরেজের বাঙ্গালায় আধিপত্য লাভের প্রধান সহায় হইল।

এই ষড়যন্ত্রের ফল প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ। ১৭৫৭ অব্দের ৩০শে জুন (পলাশীর যুদ্ধের সাত দিন পরে) জগৎ শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্র-কারীদের প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল। এইখানেই শ্বেত ও লোহিতবর্ণ প্রতিজ্ঞাপত্রের রহস্যের উদ্ভেদ হয়। এইখানেই উমী-চাঁদের মাথায় বজ্র পড়ে।

ইহাতে শেঠদিগের কি লাভ বা কি ক্ষতি হইয়াছিল, ইতি-হাসে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু ইংরেজ দরবারে শেঠ-দিগের সম্মান ও সমাদর যে বাড়িয়া উঠে, তাহা অনেকেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শেঠদিগের মন্ত্রণায় ও অর্থবলেই ইংরেজদিগের আধিপত্য লাভ হয়। ১৭৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীরজাফর ও জগৎ শেঠ মহাতাব রায় কলিকাতায় আই-সেন। কেবল নবাবের অভ্যর্থনার জন্য ইংরেজেরা ৯০,০০০ টাকা ব্যয় করেন; আর জগৎ শেঠের পরিচর্য্যার জন্য ১৭,৫৭৪ মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

শেঠগণ ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের সর্ব্বনাশ করিলেন বটে, কিন্তু অতঃপর তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাঁহারা যত্ন করিয়া মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইয়া-ছিলেন। কিন্তু শেষে অভিনব নবাবের প্রার্থনা পূরণে তাঁহারা একান্ত অসমর্থ হইলেন। মীরজাফর তাঁহাদিগকে টাকার জন্য বারংবার বিরক্ত করিতে লাগিলেন। শেঠগণ তাঁহার প্রার্থনানুরূপ অর্থ দান করিয়া তাঁহাকে সন্তোষিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু শীঘ্রই মীরজাফরের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিল। তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার স্থলে মীরকাসেম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

মীরকাসেম ১৭৬০ অব্দের অক্টোবর মাসে নবাব হইলেন। তিনি সকল বিষয়েই সমান দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেঠদিগের প্রতিও তাঁহার সৌজন্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে শীঘ্রই এ অনুগ্রহ বিলুপ্ত হইল। মহাতাব রায়ের কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। জগৎ শেঠ মহাতাবের সহিত ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মীরকাসেম এজন্য তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করিয়া, মুঙ্গেরের দুর্গে রাখেন। ইহাতে ইংরেজ গবর্ণর ১৭৬৩ অব্দের ২৪শে এপ্রেল নবাবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন,—"আমি এই মাত্র অমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম, মহম্মদ তকি খাঁ ২১শে তারিখ রাত্রিতে মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদের গৃহে গিয়া, তাঁহাদিগকে হীরা ঝিলে আনিয়া সৈনিকগণের পাহারায় রাখিয়াছেন। আমি ইহাতে নিরতিশয় বিস্মিত হইতেছি। যখন আপনি নবাবী পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে আমার, আপনার ও শেঠদিগের সাক্ষাতে স্থির হইয়াছিল যে, আপনি শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে শেঠদিগের পরামর্শ লইবেন, এবং কখনও তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ বা হৃতসর্ব্বস্ব করিবেন না। যখন মুঙ্গেরে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখনও আমি এ সম্বন্ধে এই ভাবে আপনাকে অনেক কথা কহিয়াছিলাম। আপনিও শেঠদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না, বলিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, অবরুদ্ধ করা অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে, আমাদেরও সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়াছে, এবং আপনার ও আমার সম্মান বিনষ্টপ্রায়

হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আমাদের দুর্ণাম করিবে। পূর্ব্বতন নবাবেরা কেহ কখন শেঠদিগকে এমন অপদস্থ করেন নাই।" ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের এই অনুরোধ বিফল হইল। উদয়-নালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীরকাসেম ক্রোধে অধীর হইয়া, পাটনায় ইংরেজদিগকে হত্যা করিলেন, সেই সঙ্গে মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদও নৃশংসরূপে নিহত হইলেন।

মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুশলচাঁদ, এবং স্বরূপ-চাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উদয়চাঁদ। বাদশাহ শাহ আলম্ কুশল-চাঁদকে "জগৎ শেঠ" ও উদয়চাঁদকে "মহারাজ" উপাধি দিলেন। ইঁহারা উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন।

মীরকাসেমের পর মীরজাফর পুনর্ব্বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। এই সময় হইতে শেঠদিগের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। মীরকাসেম যখন মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করেন, তখন মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র গোলাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু মিহিরচাঁদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় শেষে অযোধ্যার নবাবের হস্তে পতিত হয়েন। ইঁহাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিলে নবাব অনেক অর্থ চাহিলেন। কুশল-চাঁদ ও উদয়চাঁদ এজন্য ক্লাইবকে এক খানি অনুনয়পূর্ণ পত্র লিখিয়া, আপনাদের দীনতা ও দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন। কিন্তু এই বিনয়পূর্ণ প্রার্থনায় ক্লাইবের হৃদয় আর্দ্র হইল না। ক্লাইব কঠোরভাবে ১৭৬৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহাদের পত্রের এই উত্তর দিলেন,—"আমি যেরূপ যত্নের সহিত আপনার

পিতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি এবং এই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ সৌহৃদ্য দেখাইয়া আসিতেছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এখন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার ও সাধারণের উপকারের জন্য আপনাদিগকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আপনারা বিবেচনা করিতেছেন না, এজন্য আমার সাতিশয় ক্ষোভের উদয় হইতেছে। * * আমি দেখিতেছি, আপনাদের সমস্ত ধন আপনাদের গৃহে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। * * আমি জানিয়াছি, যখন জমীদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের পাঁচ মাসের খাজানা বাকী ছিল, তখন আপনারা আপনাদের পিতার প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে ক্রটি করেন নাই। আমি কখনও এমন কঠোর কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না। আপনারা এখনও সাতিশয় সমৃদ্ধিপন্ন বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি আপনাদের এই অর্থলোভই শেষে আপনাদের উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, এবং আপনারা সকল সময়ে সাধারণের উপকারে উদ্যত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, তাহাও বুঝি নষ্ট হয়।"

শেঠেরা ইহার পর বৎসর ইংরেজদিগের নিকটে ৫০।৬০ লক্ষ টাকার দাবী করেন। এই টাকার মধ্যে ২১ লক্ষ, মীরজাফর ও কোম্পানির সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, মীরজাফরকে দেওয়া হইয়াছিল। ক্লাইব এই ২১ লক্ষ টাকার দেনা স্বীকার করেন, এবং ইহা কোম্পানি ও নবাব, উভয়েই সমান অংশে শোধ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই বৎসর কলিকাতার কৌন্সিল শেঠদিগের নিকটে আবার দেড় লক্ষ টাকা ঋণ করিতে উদ্যত হয়েন।

ক্লাইবের যত্নে ১৭৬৫ অব্দে কোম্পানি যখন সম্রাট শাহ আলমের নিকটে বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন কুশলচাঁদ জগৎ শেঠ কোম্পানির ধনরক্ষক হয়েন। এই সময় কুশলচাঁদের বয়স আঠার বৎসর।

লর্ড ক্লাইব কুশলচাঁদকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশলচাঁদ ইহা লইতে সম্মত হয়েন নাই। কুশলচাঁদের মাসিক ব্যয় লক্ষ টাকা ছিল। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কুশলচাঁদ জীবদ্দশায় আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশনাথ পাহাড়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান। তত্রত্য অনেক গুলি বিগ্রহ তাঁহার প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেকে অনুমান করেন, কুশলচাঁদের অপরিমিত ব্যয়েই শেঠ দিগের হীনাবস্থা হয়। কিন্তু ইহার আর কয়েকটি কারণ আছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষে শেঠগণ বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ১৭৭২ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার মুর্ষিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহাদের দুরবস্থা হয়। শেঠেরা আপনাদের অবনতির আরও একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, কুশলচাঁদ বহুসংখ্য অর্থ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সে কথা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আর কেহই এ বিষয় অবগত ছিলেন না। সুতরাং যেখানকার টাকা সেইখানেই রহিল। কেহই মাটি হইতে তাহা উঠাইতে পারিলেন না।

ইহার পর শেঠদিগের অধঃপতনের কথা। এ কথা অতি সামান্য। কুশলচাঁদের পুত্র ছিল না। ইনি ভ্রাতৃপুত্র হরক-

চাঁদকে দত্তকপুত্র করেন। ইংরেজেরা দিল্লীর দরবারের অনুমতি না লইয়াই ইঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধি দেন। প্রথমে হরকচাঁদের বড় অসচ্ছলতা হইয়াছিল। শেষে তিনি তাঁহার পিতৃব্য গোলাপচাঁদের সম্পত্তি পাইয়া কিছু সচ্ছল হয়েন। হরকচাঁদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্রকামনায় কোন উদাসীনের পরামর্শে জৈন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শেষে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রচাঁদ "জগত শেঠ" উপাধির অধিকারী হয়েন। ইন্দ্রচাঁদের পর তদীয় পুত্র গোবিন্দচাঁদ পিতৃসম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দচাঁদকে কোন উপাধি দেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে বহুসম্মানিত "জগত্ শেঠ" উপাধি অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্রচাঁদের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। গোবিন্দচাঁদ কিছু দিন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মণিমুক্তাপ্রবলাদি বিক্রয় করিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, শেষে কোম্পানি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কৃত উপকার মনে করিয়া, তাঁহাকে বার্ষিক ১২,০০০ টাকা বৃত্তি দিবার নিয়ম করিয়া দেন।

যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই শেঠ বলা যায়। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শেঠ উপাধিধারী অনেক লোক বাস করে। ইহাদের সহিত মুর্ষিদাবাদের বিখ্যাত জগৎ শেঠের কোন সংশ্রব নাই। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৫১ অব্দের ৩০শে মে কলিকাতার কৌন্সিলের সভাপতিকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি শুনিলাম, রামকৃষ্ণ শেঠ নামক এক ব্যক্তি মুর্ষিদাবাদে কর না দিয়া, কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। এই ব্যক্তি কাহারও ভয়ে বিচলিত নহে। আমি আপনকে

লিখিতেছি, আপনি এক জন চোপদার পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবেন, এবং যত শীঘ্র পারেন, এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি যেমন লিখিলাম, তদনুসারেই যেন কাজ হয়।" কৌন্সিলের অধ্যক্ষ এইভাবে নবাবের পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন,—"রামকৃষ্ণ শেঠ কোম্পানির দাদন লইয়া দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। তাহার নিকট কোম্পানির অনেক টাকা পাওনা আছে। এজন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না" রেবারেণ্ড্ লঙ্গসাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয়, এই ব্যক্তি তদ্বংশীয়। কিন্তু বিখ্যাত জগৎ শেঠের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড ক্লাইবের চন্দননগর আক্রমণপ্রসঙ্গে ইতিহাসলেখক অর্ম্ম সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের সহিত ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল। মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে দেড় কোটী টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠগণ ইংরেজদিগকে অনেক টাকা দেন। ব্রিটিশ সৈন্যের তরবারির ন্যায় জগৎ শেঠের মন্ত্রণা এবং জগৎ শেঠের অর্থও মুসলমানকে অপসারিত করিয়া, শ্বেত-পুরুষকে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহিত করিয়াছে। এখন শেঠ-দিগের সে সমৃদ্ধি, সে গৌরব, সে ক্ষমতা, অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। জগৎ শেঠের বংশধর এখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, সামান্য ভাবে দিনপাত করিতেছেন।

বাঙ্গালীর বীরত্ব

বাঙ্গালার পূর্ব্বতন গৌরব অনেক ছিল। বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন বীরত্বও অনেক ছিল। আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যাঁহাদের মনোবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনায় বাঙ্গালী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই ;—

"সেনানায়ক সেই রঘু, রণতরীতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত বঙ্গবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া, গঙ্গার মধ্যস্থ দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে পটু ছিল এবং তখন বাঙ্গালা স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়-পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্যের জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। পাল ও সেনবংশের বীরত্বের বিবরণ আজিও বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যে একখানি তাম্রশাসনপত্র পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়ের অধিপতি দেবপাল দেব মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধাশ্ব যুদ্ধার্থ কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়াছিল। রাজসাহীতে সেনবংশের যে অনুশাসন-পত্রে পাওয়া যায় তাহাতেও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এইরূপ

দিগ্বিজয়বর্ণনা দেখা যায়। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বাঙ্গালী। তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে ইঁহাদের আবাস ছিল। হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরের ভূপতিগণ মুসলমান হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে নিতান্ত ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

এক জন পণ্ডিত লেখক বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে গিয়া, বাঙ্গালীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই পড়া উচিত। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইঁহার লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে,—

"পাঠানেরাই এতদ্দেশে মুসলমানজয়পতাকা উড্ডীন করেন। ৩৭২ বৎসর পরে তাঁহাদিগের রাজত্বের শেষ সময়ে, এ দেশের কত দূর তাঁহাদিগের অধিকৃত ছিল, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কোচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"

এগুলি প্রকৃত ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার এই ইতিহাসের

সমালোচনাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত কথা উদ্ধৃত করিয়া, এক জন সুবিজ্ঞ সমালোচক অভিমানের সহিত বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।" স্বদেশবৎসল বাঙ্গালী, স্বদেশের পূর্ব্বতন গৌরবে উন্নত হইয়া, সরলভাবে যে সরল বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমরাও সরলভাবে সেই সরলবাক্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি,—"বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।"

পাঠানেরা যে, কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছেন, এ কথা প্রকৃত নহে। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর মোগলের আধিপত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদের দেশের সকলেই জানেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কাপুরুষের ন্যায় আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, এবং কখনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রান্ত বারভূঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরাক্রমশালী ভূঁইয়ার নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধপোত ছিল। ইঁহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইঁহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধপোত দিয়া, বাদশাহের সাহায্য করিতেন। ইঁহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের ক্ষমতায় স্বাধীন হয়েন। ইঁহারা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না।

কিন্তু শিবিরে আসিতে না আসিতেই সংবাদ আসিল, রাজা মানসিংহ যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ঈশা খাঁ অশ্বারোহণে তড়িদ্‌বেগে সমরভূমিতে উপস্থিত হইয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজা মানসিংহ বলিয়া ভালরূপে চিনিতে না পারিবেন, তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। শেষে ঈশা খাঁ জানিতে পারিলেন যে, উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী যথার্থই রাজা মানসিংহ। সুতরাং যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। ঈশা খাঁ আপনার তরবারি রাজাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ না করিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ঈশা খাঁও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্লযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর উদারতা, সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষত্রিয়-বীর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না, ঈশা খাঁকে আপ্যায়িত করিয়া, অনেক উপহার দিয়া বিদায় দিলেন।

ঈশা খাঁ ইহার পর রাজা মানসিংহের সহিত আগরাতে সম্রাট্ অকবরের নিকটে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। শেষে সম্রাট্ যখন এগারসিন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, তখন কালবিলম্ব না করিয়া, ঈশা খাঁকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে "দেওয়ান" ও"মসনদ্‌ইআলি"উপাধি এবং বাঙ্গালার অনেক পরগণা দিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক জন বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঈশা খাঁর বংশধরেরা

পূর্ব্ববাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত জমীদার বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহাদের বংশের সে সাহস, সে বীর্য্য, এক্ষণে অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ঈশা খাঁকে ছাড়িয়া দিলেও বলশালী খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালীর অভাব হইবে না। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতিগণ অনেক সময়ে যুদ্ধে অসামান্য সাহস দেখাইয়া, বীরত্বের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের স্বাধীনতা অক্ষত রহিয়াছে। বিক্রমপুরের কায়স্থবংশীয় চাঁদ রায় ও কেদার রায় এক সময়ে পরাক্রান্ত ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে ঈশা খাঁর বীরত্বে মোগল-সেনানী বিস্মিত হয়েন, সেই ঈশা খাঁর সহিত এই দুই ভ্রাতার সর্ব্বদা যুদ্ধ হইত। ঈশা খাঁর সহিত যুদ্ধে চাঁদ রায় ও কেদার রায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্পনারায়ণ রায় ও সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দ রায় বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রিঃ অব্দে রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ দর্শন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমানকালের স্বাধীন রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। কন্দর্পনারায়ণের অনেক সমরপোত ছিল। অদ্যাপি তাঁহার একটি পিত্তলের কামান চন্দ্রদ্বীপে আছে। ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রমুকুন্দিয়ানামক স্থানে মুকুন্দ রায়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম দিল্লীশ্বরের এক জন সেনাপতিকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎ মোগল সম্রাট্‌ জাহাঁ-গীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদিগের এইরূপ

প্রতাপ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাজা সীতারামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ সীতারামকে এক জন ডাকাইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই কথার অনুমোদন করি না। সীতারাম এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার। সে সময়ে বাঙ্গালায় আর কেহই সাহসে ও বীরত্বে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর নামে অদ্যাপি যশোহরের লোকের হৃৎকম্প হইয়া থাকে। সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহাদুর শাহ ও ফরাৰোখ্‌সয়ের যথাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা দ্বাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাক্‌লার অধিস্বামিগণ বাদশাহকে কর দিতেন না। কথিত আছে, বাদশাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই এই অবাধ্য জমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম বাদশাহের আদেশলিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করিয়া দ্বাদশ চাক্‌লার অধিকারী হয়েন। ইহার পর সীতারাম স্বাধীন হইয়া দিল্লীর বাদশাহকে কর দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এজন্য দিল্লীর দরবার হইতে আবুতোরাপ নামক এক জন সেনানী সীতারামের বিরুদ্ধে আগমন করেন। সীতারামের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হয়েন। বাঙ্গালার নবাব সীতারামের শাসন জন্য অনেক বার সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সীতারামের বীরত্বে এবং তাঁহার সেনাপতি মহাপরাক্রম মেনাহাতীর বাহুবলে নবাবের সৈন্য পরাভূত হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালী শত্রুর আক্রমণে পলায়ন করিত না।

যে সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-

দণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন, সে সময়ে রাজা কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা রামনারায়ণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। মস্তাফা খাঁ যখন বিদ্রোহী হইয়া, আলীবর্দ্দী খাঁর সৈনিকদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজিমাবাদ আক্রমণ করেন, তখন তথাকার দেওয়ান জৈন উদ্দীন, কীর্ত্তিচাঁদ ও রামনারায়ণের হস্তে সৈন্যাধ্যক্ষতা সমর্পণ করেন। ইঁহারা অন্যান্য মুসলমান সেনাপতির ন্যায় মস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকের মতে সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল বাঙ্গালী। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতায় ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন মাণিকচাঁদ আক্রমণকারী সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। এ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া, সিরাজউদ্দৌলাকে কুপরামর্শ না দিলে, পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইবের পক্ষে দুর্ঘট হইত। বাঙ্গালী এক সময়ে ব্রিটিশ তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই।

অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালী ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বুঝা যাইবে। আমরা এক্ষণে বাঙ্গালীর সাহসের একটি উদাহরণ দিব। ইতিহাস নির্দ্দেশ করে, শূরবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া 'শের শাহ' নাম ধারণ করেন। অস্তাজিলো এক সময়ে এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়া, 'শের আফগান' নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুল্যলাবণ্যবতী নুরজাহানের

সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। একাকী একটা বাঘকে মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে এই দুই বীরের সাহসের নিরতিশয় প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদ ও অস্তাজিলো যেরূপ সাহস দেখাইয়া, ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার এক জন হিন্দু যুবকও এক সময়ে সেইরূপ সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসের পত্রে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার নাম পাওয়া যায় না! এই বাঙ্গালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল পরগণা। ইনি মিত্রবংশীয়; ইঁহাদের উপাধি মজুমদার। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণের বংশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কন্দর্পনারায়ণের বংশলোপ হইলে, তাঁহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে মুর্ষিদাবাদের নবাববংশের এক ব্যক্তি উদয়নারায়ণকে এই অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। উদয়নারায়ণ মুর্ষিদাবাদে গিয়া, নবাবকে ইহা জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না; অবিলম্বে একটি ভয়ঙ্কর, প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্রসঞ্চালনকৌশলে উহাকে নিহত করিয়া, আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে কেবল বলশালী ছিল না, সাহসী বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিল।

ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য

পাটলীপুত্ররাজ অশোক এবং কাশ্মীররাজ কনিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা চারিদিকে যাইয়া, অহিংসা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার ছয় শত বৎসর পরে পালিভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খ্রিঃ ৬৩৮ অব্দে শ্যামদেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারকেরা যাবায় যাইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে দেশের পর দেশ যখন বৌদ্ধধর্ম্মের নিকটে অবনতমস্তক হইতেছিল, তখন কতিপয় প্রচারক মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক চীনে গিয়া, আপনাদের ধর্ম্ম বদ্ধমূল করেন। কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের জীবনীশক্তি আবার উদ্দীপিত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এ দিকে পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর ও পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হয়। খ্রিঃ ৩৩২ অব্দে কোরিয়াবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। খ্রিঃ ৫৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে গিয়া, তদ্দেশীয়দিগকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীতে এত সম্প্রসারিত হয় নাই, কোনও ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর এত অধিক লোকে আদর ও সম্মান দেখায় নাই। পৃথিবীর সমগ্র অধি

বাসীর মধ্যে শতকরা ৪০ জন বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হয়। বুদ্ধের সমকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও ব্রাহ্মণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে কেহই সাহসী হইত না। কেবল মহামতি শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, অসংসাহসের পরিচয় দেন। বুদ্ধ ধীরে ধীরে আপনার মত প্রকাশ করেন, ধীরে ধীরে লোকে তাঁহার অনুশাসনের বশবর্ত্তী হয়, এবং শেষে ধীরে ধীরে তদীয় ধর্ম্ম পৃথিবীর অনেক স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে ধর্ম্মে সুখভোগের প্রলোভন নাই; যে ধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে উপদেশ দেয় না; নির্ব্বাণলাভ যে ধর্ম্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য; সেই ধর্ম্ম কি কারণে এত বহুলপ্রচার হইল, কি কারণে ভারতবর্ষের জ্ঞানী লোকের সহিত মধ্য এশিয়ার অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীরা সেই ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ প্রসন্নসলিলা সিন্ধুসরস্বতীর প্রশস্ত তটে বসিয়া, ভক্তিভাবে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি উপাস্য দেবতার উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। শেষে সময়ের পরিবর্ত্তনে কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের বৃদ্ধি হয়; ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞের শাখাপ্রশাখার বিস্তার করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব দেখাইতে উদ্যত হয়েন। মাতৃগর্ভে অবস্থিতি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, জীব প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটি ক্রিয়ার সহিত আবদ্ধ হইতে থাকে। অনেক যজ্ঞের অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। প্রতি যজ্ঞের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম,

ভিন্নভিন্ন কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিষয়ের একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন। দশবিধ সংস্কার হইতে সমগ্র যজ্ঞের ব্যবস্থা তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও পাপ ক্ষালিত হয় না; ব্রাহ্মণ না আসিলে কোনও গৃহস্থ কোনও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন না। দৈনন্দিন কার্য্যও ব্রাহ্মণের সাহায্যসাপেক্ষ। কোন্ সময়ে কোন্ পরিচ্ছদ কি ভাবে পরিধান করা যাইবে, কোন্ বায়ু নিঃশ্বাসে লইতে হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই জানে না। কোন্ যজ্ঞে কোন্ দেবতার আবাহন করা উচিত, কোন্ দেবতাকে কি কি দ্রব্য উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কেবল ব্রাহ্মণেরাই বলিতে পারেন। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যের আরম্ভ করিলে, যদি পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ হয়, পবিত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে অসাবধানতা দেখা যায়, পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্যের ব্যবহারে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে গৃহীর সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সুতরাং হিন্দুগণ সকল সময়ে সকল অবস্থাতে ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন জাতি কোনও সময়ে পুরোহিতের এরূপ বশীভূত হয় নাই। ব্রাহ্মণের এরূপ অনুগত হইলেও হিন্দুগণ মানসিক শক্তিতে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও চিন্তাশীল ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহাদের হৃদয় ক্রমে উন্নত ও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের জটিলতা, যজ্ঞস্থলে পশুহত্যার সময়ে নিষ্ঠুরতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্রমে তাঁহাদের শান্তি তিরোহিত হইল। ক্রমে

তাঁহারা কোন নূতন প্রণালীর জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

মহামতি শাক্যসিংহ যখন আপনার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন হিন্দুদিগের হৃদয় এইরূপ তরঙ্গায়িত ছিল। এই অশান্তির সময়ে শাক্যসিংহকে হিংসা ও বৈষম্যের মূলোচ্ছেদে সমুদ্যত দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্ব লুক্কায়িতভাবে রাখিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহাদের নিকট গোপনীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহাতে নিকৃষ্টজাতি ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন! বুদ্ধ যখন এই এই ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সকলে সমান" বলিয়া সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন; স্বজাতি বিজাতি, স্বদেশী, বিদেশী, সকলের নিকটে যখন আপনার মত প্রকাশ করিলেন; তাঁহার শিষ্যগণ যখন সকল স্থানে সকলের নিকটে তদীয় মতের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে লাগিল; গ্রামে, নগরে, রাজার প্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যখন "সকলে সমান," "অহিংসা পরম ধর্ম্ম," এই মহাধ্বনি সমুত্থিত হইল; তখন অনেকে বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে এই সাম্যের মহিমাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক স্থানে প্রসারিত হইল।

ভারতবর্ষে শাক্যসিংহ সাম্যের মহিমা ঘোষণা করেন। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে আর কেহ সমগ্র বৈষম্যের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্ব্বক সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। সকলের প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রদর্শিত হওয়াতে সকলের মধ্যে সমবেদনার সঞ্চার হয়। বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একতাস্থাপন

এবং এইরূপ সমবেদনার উৎপাদন, বৌদ্ধধর্ম্মের একটি ফল। অধিকন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য মগধ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়। দক্ষিণাপথ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সংযোজিত হইয়া উঠে। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা; অশোক এই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ-কর্ত্তা। অশোক অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইয়া অনেককে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, ইহাতে তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি হয়। এত দিন দক্ষিণাপথ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। দক্ষিণাপথে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করাতে ক্রমে উহা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হয়। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় খণ্ড রাজ্য থাকা ভাল, কিন্তু সভ্যতা বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ রাজ্যে অনেক উপকার হয়। আশোকের সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধিতে উপকার হইয়াছিল, যেহেতু বাক্ত্রীয়ার গ্রীক অথবা অন্য কোন বিদেশীয় রাজা ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত করিতে সাহসী হয় নাই।

আর্য্যগণ আপনাদের ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এ দিকে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। ক্রমে অনার্য্যগণ আর্য্যদিগের সহিত সম্মিলিত ও আর্য্যদিগের কার্য্যে নিয়োজিত হওয়াতে পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝিবার জন্য আর্য্যদিগের ভাষা আয়ত্ত করে। এইরূপে আর্য্য ও অনার্য্যভাষার সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হয়; বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে যখন অনার্য্যদিগের উন্নতি হয়, যখন শূদ্রগণ প্রাধান্য লাভ করে; তখন তাহাদের ভাষাও উন্নত হইয়া উঠে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য প্রাকৃত ও পালিভাষার পরিপুষ্টি হয়।

এদিকে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা নানা উপায়ে আপনাদের ধর্ম্ম সঞ্জীবিত করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিতে হিন্দুধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। শ্রমণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও স্থানে স্থানে সম্পূজিত ও সম্মানিত হইতেছিলেন। অহিংসার পার্শ্বে হিংসার, সাম্যের পার্শ্বে বৈষম্যেরও প্রভাব দেখা যাইতেছিল। খ্রিঃ ২৪৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রিঃ ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক হাজার বৎ-সরেরও অধিক কাল উভয় ধর্ম্মের এইরূপ প্রাধান্য ছিল। পর-বর্ত্তী দুই শত বৎসরে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হয়। মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিস্রোত যখন সঙ্কীর্ণ হয়, তখন যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এত দিন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন, তাঁহারা বিপুল উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণের বিদ্যাবুদ্ধির মহিমায় ও ক্ষত্রিয়ের অর্থের ক্ষমতায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার উন্নত হইতে থাকে। বৌদ্ধের চৈত্য, বৌদ্ধের মঠ, ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত বৌদ্ধের অট্টালিকা স্থানে স্থানে শোভা-বিকাশ পূর্ব্বক সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুগণ ইহা দেখিয়া বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের প্রতিমূর্ত্তির পূজা হইতে লাগিল। লোকে বৌদ্ধমন্দিরের পার্শ্বে হিন্দুমন্দিরের গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বুদ্ধের প্রতি মূর্ত্তির পার্শ্বে রামসীতা, কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তির পূজায় হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল। এ দিকে হিন্দুগণ কোমল ভাষায়,

কোমলকণ্ঠে আপনাদের ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীরগণের চরিত্র নানা স্থানে গাইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোকে এই মধুর কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। হিন্দু যোগিগণ স্বার্থত্যাগে, ও কঠোর ব্রতাচারণে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিলেন। এই সকল যোগী প্রখর রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায়, অনাবৃত স্থানে, উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া একান্তমনে যোগাভ্যাস করিতেন। গ্রীকেরা ইহাদের কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন সাধারণে ধর্ম্মের জন্য ইহাদের এইরূপ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া হিন্দুদিগের পদানত হইতে লাগিল। অবশেষে বৌদ্ধগণ নানাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহারা সকল শ্রেণীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হওয়াতে হীনবল হইয়া পড়িলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণগণ যথোচিত সাহস সংগ্রহ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই বিমুখ হইলেন না। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাদের ক্ষমতা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, সহস্র সহস্র লোকে অবনতমস্তকে তাঁহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল। খ্রিঃ ১,০০০ অব্দে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অন্তর্হিত হইল। হিন্দুর আবাসভূমিতে হিন্দুধর্ম্ম আবার গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হিন্দুগণ সকল বিষয়েই আপনাদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সুতরাং ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুগণ ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠেন। ক্রমে তাঁহারা অভিনব বিষয়ে উদ্ভাবনা দেখাইয়া, সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে থাকেন। উপনিষদে যে সকল গভীর তত্ত্বের বিবরণ আছে, বোধ হয়, তৎসমুদয় সমগ্র জগতের আদিম দর্শনশাস্ত্র। ঐগুলি

সে সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। মহাভারতের সময়ে দর্শনশাস্ত্রের আবার জীবনীশক্তি লক্ষিত হইলেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। মহামতি শাক্যসিংহ যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠেন, সকল স্থানে যখন সাম্য ও অহিংসার আদর লক্ষিত হইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় বুদ্ধকে অধঃকৃত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন। হিন্দুদিগের এইরূপ মানসিক উন্নতিতে দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকে। এই সময়ে উন্নতাবস্থ ষড়্দর্শনের প্রচার হয়। স্মৃতি হিন্দুদিগের আচারব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থ। এই সময়ে উহা সংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল হয়। এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবকালে প্রায় সকল দিকেই হিন্দুদিগের মানসিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভারতবর্ষের গৌরবের একটি প্রধান সময় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও সাধারণের উন্নতি ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন দেখা যাইতে থাকে। জ্ঞানভাণ্ডারের এক দিকে প্রতিভা ও গবেষণার আলোক বিকাশ হইলে, ক্রমে অন্যান্য দিকও ঐ আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং লোকসমাজের এক দিকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, ক্রমে সেই স্রোত সমগ্র সমাজ আন্দোলিত করে। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তাহাতে ভারতের লোকসমাজ এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল সজীব ও সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে সমাজের সকল বিভাগেই অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার দেখা যাইতেছিল; সকল বিভাগই যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তেজস্বিতার মহিমায় সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর ছিল। এই সময়ে হিন্দুগণ

বিস্তীর্ণ সাগরের তরঙ্গমালা অতিক্রম পূর্ব্বক বালী ও যবদ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেন; আরব ও মিশরের সহিত বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপনাদিগকে লোকসমাজের বরণীয় করিয়া তুলেন। ইঁহাদের দূতগণ রোমের সম্রাটের নিকটে আদরসহকারে পরিগৃহীত হয়েন। ইঁহাদের কার্পাসবস্ত্র, মসলিন, রেশমী কাপড়, নীল, চিনি, হীরক, মুক্তা প্রভৃতি আরব ও মিশরের বণিকগণ গ্রহণ করিয়া, আপনাদের দেশ সমৃদ্ধ করিতে থাকেন, এবং ইঁহাদের শাসনপ্রণালীর শৃঙ্খলা ও নগরের পারিপাট্য দেখিয়া, বিদেশী ভ্রমণকারিগণ ইঁহাদিগকে শত গুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন। এ দিকে আর্য্যগণ সারস্বতী শক্তির উপাসনায় সবিশেষ যত্নশীল হয়েন। তাঁহারা জ্ঞানের মহিমায়, দূরদর্শিতার গরিমায় ক্রমে জগতের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। খ্রিষ্টীয় শকের প্রারম্ভ হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয়গণ শাস্ত্রালোচনায় আপনাদের অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদির শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদীনির্ম্মাণপ্রসঙ্গে জ্যামিতি ও গণিতবিদ্যারও যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছিল এবং স্বরসংযোগে বেদগানসময়ে মন্ত্রের উচ্চারণবিশুদ্ধতা রক্ষার প্রসঙ্গে ব্যাকরণেরও অনুশীলন হইয়াছিল; কিন্তু এই সময়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে জ্যোতিষ ও গণিতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বরাহমিহির এই সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আর্য্যভট্ট এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ বিধানে যত্নশীল হয়েন। ভাস্করাচার্য্য ও লীলাবতী গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। চরক ও সুশ্রুতের যত্নে চিকিৎসাবিদ্যার ভূয়সী উন্নতি

হয়। কালিদাস অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া চির-প্রসিদ্ধ হয়েন। অমরসিংহ অভিধান সঙ্কলন পূর্ব্বক সাহিত্য আলোচনার পথ সুগম করিয়া দেন। এই রূপে ভারতবর্ষের গৌরবের সময়ে সকল বিষয়েরই ক্রমোৎকর্ষ হইতে থাকে। আরবেরা ভাবতবর্ষ হইতে জ্ঞানিরত্ন আহরণ পূর্ব্বক আপনাদি-গকে সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে রোমে উহার আলোক প্রসারিত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণির নিরক্ষর অসভ্যগণ আপনাদের আরণ্য ভূখণ্ডে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল।

হিউএন্ থ্সঙ্গের ভারতভ্রমণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে তদ্দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকসমূহের অনুবাদে কৃত-সঙ্কল্প হয়েন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল। কপিল-বস্তু, বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী, বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থ; সুতরাং পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহ মানসে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ ভারত-বর্ষে আসিতে উদ্যত হয়েন। চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থলপথে আসিতে হইলে অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষ-লতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষারমণ্ডিত দুরারোহ পর্ব্বত, অন্ধকারময়

সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়সম্পন্ন চীনদেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন; পথের এই দুর্গমতা তাঁহাদের নিকটে সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েক জন স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ গোবি মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন; কেহ কেহ অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সাহসী পরিব্রাজক চিটেওয়ান্ খ্রিঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকটে আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খ্রিঃ পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিলবিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দলে পাঁচ জন শ্রমণ ছিলেন। ইঁহাদের অধিনায়কের নাম ফা-হিয়ান। ফা-হিয়ান খ্রিঃ ৩১১ অব্দ হইতে খ্রিঃ ৪১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। ফা-হিয়ানের পর হোইসেঙ্গ ও সঙ্গ-যুনের ভ্রমণবিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুই জন শ্রমণ খ্রিঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাট্‌পত্নী কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক শত বৎসর পরে আর এক জন ধর্ম্মবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিদর্শনে ও নানা শাস্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া, সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গবেষণা ও দূর-

দর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, সিদ্ধিও সেইরূপ মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য বিঘ্নবিপত্তিপূর্ণ সময়ে রাজার অজ্ঞাতসারে, রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন, শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে গিয়া, রাজদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হয়েন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিত-হৃদয় ধর্ম্মবীরের নাম হিউএন্ থ্সঙ্গ।

হিউএন্ থ্সঙ্গ চীনদেশের কোন একটি উপবিভাগের নগরে খ্রিঃ ৬০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য দীর্ঘ-কালস্থায়ী অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যাহা হউক; হিউএন্ থ্সঙ্গের পিতা কোন রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, শেষে কর্ম্ম ছাড়িয়া আপনার সন্তানচতুষ্টয়কে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই চারি সন্তানের মধ্যে দুইটি বাল্যকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সারগ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাদের অন্যতরটি হিউএন্ থ্সঙ্গ।

হিউএন্ থ্সঙ্গ প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠে বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ বৌদ্ধযতির শ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর।

পরবর্ত্তী সাত বৎসর হিউএন্ থ্সঙ্গ ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তত্ত্ববিৎ ও প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। নানাস্থানে সর্ব্বদা বিগ্রহ

উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার নির্জ্জনপাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তিনি দূরতর স্থানের নির্জ্জনপ্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অশান্তিতে—বিদ্রোহের এইরূপ বিপ্লবিপত্তিপূর্ণ সময়েও হিউএন্ থ্সঙ্গ অধ্যয়ন হইতে বিরত হয়েন নাই। শাস্ত্রালোচনা তাঁহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। কুড়ি বৎসর বয়সে হিউএন্ থ্সঙ্গ বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই নবীন বয়সে তিনি অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শন-শাস্ত্র, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি চীনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রালোচনার স্থানে, ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদ্গণের পদতলে বসিয়া, ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল তত্ত্ববিৎ তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন। বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউএন্থ্সঙ্গ্ সেইরূপ অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোথাও প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অনূদিত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না, বরং অনুবাদপাঠে সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। তিনি মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ফাহিয়ান্ প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। এখন তিনিও

এই সকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চীন সাম্রাজ্য অন্তর্ব্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে হিউএন্ থ্সঙ্গ এবং আর কয়েক জন পুরোহিত পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য সম্রাটের নিকটে আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউএন্ থ্সঙ্গের সহযোগিগণ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সঙ্গ ভারতবর্ষে আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি প্রাণ পণ করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলেন।

খ্রিঃ ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হিউএন্ থ্সঙ্গ এইরূপ অবিচলিতহৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে আসিলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষযাত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা, সকলকে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সঙ্গ অপরাপর বৌদ্ধদিগের সাহায্যে শান্তিরক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে চরগণ তাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইল। কিন্তু এই তরুণবয়স্ক যতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এরূপ অধ্যবসায় এবং এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। এ পর্য্যন্ত দুই জন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এইখানে তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ পরি-

চালকবিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইতে সম্মত হইল। হিউএন্ থ্সঙ্গ ইহার সঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই পথপ্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এখন আরও পাঁচটি গুম্বজ অতিক্রম করা বাকী ছিল। প্রতি গুম্বজ রক্ষিগণ দিবারাত্র পাহারা দিত। এ দিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদচিহ্ন বা কঙ্কাল ব্যতীত পথজ্ঞাপক অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউএন্ থসঙ্গ বিচলিত হইলেন না। তিনি মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়াও ধীরভাবে প্রথম গুম্বজের নিকটে উপনীত হইলেন। এইখানে রক্ষিবর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইতে পারিত, কিন্তু এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাহসী তীর্থযাত্রীকে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং অন্যান্য গুম্বজের নিকটে যাইতে ইহার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক এক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ গুম্বজ অতিক্রম করিয়া, আর একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এইখানে তিনি পথহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি যে চর্ম্মভাণ্ডে করিয়া জল আনিতেছিলেন, হঠাৎ তাহা ফাটিয়া গেল। হিউএন্ থ্সঙ্গ পথহারা হইয়া, সেই ভীষণ মরুভূমিতে জলের অভাবে নিরতিশয় কষ্টে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অটল সাহস ও অধ্যবসায় এতক্ষণে বিচলিতপ্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ

যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। হিউএন্ থ্সঙ্গ কহিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হই, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায়, তাহাও ভাল। তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব্ব দিকে ফিরিব না।" হিউএন্ থ্সঙ্গ আবার পশ্চিম দিকে ফিরিলেন, এক বিন্দু জল পান না করিয়া, চারি দিন পাঁচ রাত্রি, সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক হইতে উপদেশসমূহের আবৃত্তি করিয়া, হৃদয়ের শান্তি সম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীর এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের বলে বলীয়ান্ হইয়া, একটি বৃহৎ হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ তাতারদিগের অধিকৃত। তাতারেরা হিউএন্ থ্সঙ্গ্কে আদরসহকারে গ্রহণ করিল। এক জন তাতার ভূপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিউএন্ থ্সঙ্গকে আপনার লোকদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতারভূপতি শেষে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "ভূপতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমার মন এবং আমার ইচ্ছার উপর তিনি কোনরূপে ক্ষমতা স্থাপন করিতে পারেন না।" এইরূপে আবদ্ধ হইয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ তাতাররাজ্যে দেহপাত করিবার জন্য আহারপান হইতে বিরত হইলেন। তাতারভূপতি এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনি-

বার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউএন্ থ.সঙ্গ্ এক মাস কাল এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এক মাস কাল ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ আপনাদের পবিত্রস্বভাব অতিথির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন তাতাররাজের আদেশে বহুসংখ্য অনুচর হিউএন্ থ্সঙ্গের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার দিয়া, এই তীর্থযাত্রীর দল যাইবে, তাতারভূপতি তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ অনুচর-গণের সহিত অনেকগুলি তুষারমণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক বক্ত্রিয়া ও কাবুলিস্তান দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন। এই সকল তুষারসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার চৌদ্দ জন অনুচর বিনষ্ট হয়।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক সমূহের অধ্যাপনা হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসি-গণ রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীতব্যবসায়ীরা গানবাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার

প্রধান স্থান বলিয়া সমগ্র ইউরোপে সম্মানিত হইত, এই সময়ে মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ নগরেরও সেইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ সমরখন্দবাসীদিগের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিত। বিষয়প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এস্থানে বর্ণিত হইল। হিউএন্ থ্‌সঙ্গ যেখানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূরদর্শিতায়, ভাবের উচ্চতায় এবং বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে।

হিউএন্ থ্‌সঙ্গ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক কাঁবুল দিয়া, পুরুষ-পুরে (পেশাবর) উপনীত হয়েন, এবং এই স্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম পূর্ব্বক মগধে উপস্থিত হয়েন। এত দিনে অধ্যবসায়সম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসনা চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ—কপিলবস্তু শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন, মধ্য ভারত-বর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অব-স্থার সন্ধান লইলেন, দক্ষিণাপথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন; একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থান তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া, এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়সম্পন্ন লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, একটি অসহায়, দরিদ্র যুবক আপনার সাহস ও উদ্যম, ইহার উপর

আপনার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউএন্ থ্সঙ্গ সিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাঞ্চীপুরে (কঞ্চিবিরম) গিয়া শুনিলেন, সিংহল দ্বীপ অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য তিনি সিংহলে গেলেন না, কঞ্চিবিরম হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণাপথ অতিক্রম পূর্ব্বক মলবার উপকূলে গমন করিলেন; এবং সেস্থান হইতে সিন্ধু নদ দিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন পূর্ব্বক মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ এই স্থানে তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছু দিন একত্র বাস করিয়া, সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। ইহার পর এই পরিব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলিস্তান দিয়া মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে আসিলেন এবং তুর্কিস্তান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে কিছু কাল থাকিয়া, ষোল বৎসর কাল ভ্রমণ, অধ্যয়ন, ও বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর খ্রিঃ ৬৪৫ অব্দের বসন্তকালে আপনার গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর গৌরবশ্রীতে সমুন্নত হইয়া, দীর্ঘকালের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন; তাঁহার প্রতিপত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ এই প্রতিপত্তিশালী দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। এক সময়ে চরগণ যাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণ যাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আদেশ পাইয়াছিল, তিনি

এথন প্রভূত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলেন। চীনের রাজধানীতে তাঁহার প্রবেশসময়ে মহোৎসরের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ সকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল; উহার উপর সুগন্ধি পুষ্পসমূহ শোভা বিকাশ করিতে লাগিল; স্থানে স্থানে জয়পাতাকাসমূহ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল; সৈনিক পুরুষেরা পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; রাজপুরুষগণ আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনন্দন করিয়া আনিতে গমন করিলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হইলেও, বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্‌সঙ্গ বুদ্ধের স্বর্ণ রৌপ্য ও চন্দন কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি এবং ৬৫৭ থানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট উহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্‌সঙ্গ বিনীতভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনায় জীবিতকালের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ পুরোহিতের সহিত, ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তকসমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল।

কিন্তু সংস্কৃত পুঁথি সমূহের অনুবাদে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। কথিত আছে, হিউএন্ থ্সঙ্গ বহুসংখ্য সহযোগীর সাহায্যে ৭৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদসময়ে তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দুরূহ অংশের অর্থপরিগ্রহের জন্ম নির্জ্জন স্থানে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণসময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ চিন্তা করিতে করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, সেইরূপ প্রফুল্ল হইতেন।

এইরূপে ধর্ম্মচিন্তা, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গ্রন্থপ্রচার করিয়া, হিউ-এন্ থ্সঙ্গ্ ক্রমে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি মৃত্যুসময়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিয়া, তাঁহাদের নিকটে বিদায় লইলেন। এই অন্তিম সময়েও তাঁহার প্রসন্নতার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎকার্য্য প্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়। অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য।" খ্রিঃ ৬৬৪ অব্দে হিউএন্ থ্সঙ্গের মৃত্যু হয় প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত মুসলমানগণ প্রাচ্য ভূখণ্ড নরশোণিতে রঞ্জিত করিতেছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণির অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে খ্রিষ্টধর্ম্মের আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল।

হিউএন্ থ্সঙ্গের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্মেরই

প্রাধান্য ছিল। হিন্দুদেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধমঠ আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়েই নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। হিউএন্ থ্‌সঙ্গ যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন, সে পথের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা উন্নত ছিল। কপিশা রাজ্যে (বর্ত্তমান কাবুলিস্তান) এক জন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। এইখানে এক শতটি মঠে ছয় হাজার শ্রমণ থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যা দেবমন্দির ছিল। সন্ন্যাসিগণ কেহ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত; কেহ সমস্ত দেহে ভস্ম মাখিত, কেহ বা কপালসমূহ অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিত। পেশাবর কপিশা রাজ্যের অধীন ছিল। এই স্থানে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের নির্ম্মিত বহুসংখ্য ভগ্ন মঠ কালের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছিল। কাশ্মীরের রাজা হিন্দুধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন। সুতরাং এই রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। থানেশ্বর ও মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। হিউএন্ থ্‌সঙ্গ কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষত্রবীরগণের বৃহদাকার কঙ্কালসমূহ দেখিয়া, বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কান্যকুব্জ রাজ্য সবিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বৈশ্যবংশীয় হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার জয়পতাকায় শোভিত করেন। ভারতবর্ষে শীলাদিত্যের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। শীলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। অযোধ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। প্রয়াগে হিন্দু

ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতেছিল। হিউএন্ থ্সঙ্গ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তুর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দুঃখিত হয়েন। বুদ্ধ বারাণসী প্রভৃতি যে কয়েকটি নগরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈশালী ভগ্নদশাপন্ন এবং উহার মঠসমূহ জনশূন্য ছিল। মগধের পঞ্চাশটি মঠে দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের বহুসংখ্য দেবমন্দির ছিল। যে প্রাচীন পাটলীপুত্র এক সময়ে সৌরাজ্য ও সমৃদ্ধির মহিমায় ভারতবর্ষের সমগ্র রাজ্যকে অধঃকৃত করিয়াছিল, কালের কঠোর আক্রমণে এই সময়ে উহার পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহার বহুসংখ্য অট্টালিকা ও বহুসংখ্য মঠের ভগ্নাবশেষ প্রায় চৌদ্দ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। হিউএন্ থ্সঙ্গ যখন বুদ্ধ গয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন নালন্দায় যাইবাব জন্য নিমন্ত্রিত হয়েন। নালন্দা গয়ার নিকটবর্ত্তী। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ এই আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ নৃপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে এই বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার বিদ্যালয় এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধবিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ-

দিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ন্যায়. দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যার আলোচনা করিলেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল বৃহৎ অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য এক শতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞ-দিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শীলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করি-তেন। নগরের কোলাহল এই স্থানের শান্তি ভঙ্গ করিত না; সাংসারিক প্রলোভন, ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ এই পবিত্র শান্তিনিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও উহা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় ভারতবর্ষে প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। প্রায় সমগ্র শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এবং অসাধারণ দূরদর্শিতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নাল-ন্দার বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হিউএন্ থ্সঙ্গ ভারতীর এই লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত

হয়েন। তিনি অভিজ্ঞতাসংগ্রহ মানসে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রমণদিগের অবিদিত ছিল না। নালন্দার শ্রমণগণ এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকের পরিচয় লইতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা হিউএন্ থ্সঙ্গকে আদরসহকারে আহ্বান করিলেন। চারি জন অভিজ্ঞ শ্রমণ নিমন্ত্রণপত্র লইয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ বিনম্রভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নালন্দায় আসিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্য বৌদ্ধ, কেহ ছত্র ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ সুগন্ধি পুষ্পসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসাগীতি গাইয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হইলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন; হিউএন্ থ্সঙ্গ বেদীর সম্মুখে গিয়া, বিনম্রভাবে বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্ থ্সঙ্গ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়। দশ জন শ্রমণ তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হয়েন। মহারাজ শীলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ এইরূপে সকলের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর নালন্দার বিদ্যালয়ে ছিলেন; পাঁচ বৎসর মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ,

ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এখন এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে নালন্দা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্ নালন্দা হইতে বাঙ্গালা, দক্ষিণাপথ ও মধ্য-ভারতবর্ষে গমন করেন। এই সকল জনপদের কোথাও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য, কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি লক্ষিত হয়। আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই স্থানের অধিপতি ব্রাহ্মণ। ইঁহার নাম ভাস্কর বর্ম্মা। ইনি "কুমার" বলিয়াও প্রসিদ্ধ। বোধ হয় "কুমার" ইঁহার উপাধি বা নামান্তর ছিল। যাহা হউক, কুমার ভাস্কর বর্ম্মা শীলাদিত্যের মিত্র ছিলেন। তাম্র-লিপ্তি (তমোলুক) একটি প্রধান বন্দর ছিল। হিউএন্ থ্সঙ্গ এই স্থানে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্য সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহারা-ষ্ট্রীয়গণ রাজপুতদিগের ন্যায় দীর্ঘকায়, সরলস্বভাব, সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিল। কোপনস্বভাব হইলেও তাহারা কৃতজ্ঞতা হইতে বিচ্যুত হইত না। তাহারা মিত্রের সাহায্য করিত, এবং শত্রুর অনিষ্ট করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাহাদের এত দূর আত্ম-সম্মানবোধ ছিল যে, শত্রুকে পূর্ব্বে না জানাইয়া, তাহার অপকারে অগ্রসর হইত না। তাহারা পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু শরণাগতের উপকার করিত। তাহাদের সেনাপতিগণ যুদ্ধে পরা-জিত হইলে নারীজাতির পরিচ্ছদ পরিত, এবং প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া, আত্মাবমাননার শান্তি করিত। তাহারা যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মদিরাপানে উন্মত্ত হইত, এবং আপনাদের হস্তীগুলিকেও

ঐরূপে প্রমত্ত করিয়া তুলিত। যুদ্ধোন্মত্ত থাকিলেও মরাঠাগণ শাস্ত্রালোচনায় অমনোযোগী ছিল না। তাহারা যথানিয়মে বিদ্যাভ্যাস করিত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এই সময়ে মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইনি যেমন উদারস্বভাব, সেইরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার দানশক্তির অবধি ছিল না। প্রজারঞ্জকতাগুণে ইনি সাধারণের নিরতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রজারা কায়মনোবাক্যে ইঁহার আদেশ পালন করিত। মহারাজ শীলাদিত্য অনেক স্থানে আপনার বিজয়পতাকা স্থাপন করেন, কিন্তু মহারাষ্ট্ররাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই।

হিউএন্ থ্সঙ্গ ভারতবর্ষীয়দিগের সরলতা ও সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়গণ প্রবঞ্চনা বা কোন বিষয় জাল করিত না। তাহারা শপথ দ্বারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়তর করিত, এবং কোনরূপ পাপ করিলে পরলোকে কঠোর শাস্তিভোগের আশঙ্কায় ভীত থাকিত। তাহাদের আচারব্যবহার সরল ও ভদ্র, এবং তাহাদের স্বভাব শান্ত ও নম্র ছিল। হিন্দুদিগের বিচারকার্য্য সাতিশয় সরলভাবে সম্পন্ন হইত। কঠোরতম শাস্তি ছিল না। বিদ্রোহীদিগেরও প্রাণদণ্ড হইত না। তাহারা কেবল যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ থাকিত। বেত্রাঘাত বা অন্য কোনরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদানের নিয়ম ছিল না। কিন্তু যাহারা ন্যায়ের অন্যথাচরণ করিত, বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হইত, কিংবা পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনে ঔদাসীন্য দেখাইত, তাহাদের হস্তপদ বা নাসাকর্ণ ছেদন করা হইত। প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে-

দণ্ড বিধান করা হইত না। দোষ স্বীকার করাইবার জন্য বেত্রাঘাতের নিয়ম ছিল না। যদি অপরাধী সরলভাবে আপনার দোষ স্বীকার করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড বিহিত হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া আপনার দোষ গোপন করিত, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল, অগ্নি, গুরুতর ভার বা বিষ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার দোষাদোষ নির্দ্ধারিত হইত।

মেগাস্থিনিসের ন্যায় হিউএন থ্সঙ্গও ভারতবর্ষে অনেকগুলি খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। এক আর্য্যাবর্ত্তেই ৭০টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রতিরাজ্যের রাজারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেন। ভারতবর্ষ বিভিন্নজাতীয় লোকের আবাসভূমি। এই সকল লোকের ভাষা ও আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। এতদ্ব্যতীত সমুন্নত পর্ব্বত, বেগবতী তরঙ্গিণী, সুবিস্তৃত অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অন্তরায়ে জনপদগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। এই সকল কারণে প্রাচীন সময়ে অনেক খণ্ডরাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খণ্ড রাজ্যের কোন ভূপতি যদি পুরু বা চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা শীলাদিত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ অধিকার পূর্ব্বক সম্রাটের গৌরবান্বিত পদে আরোহণ করিতেন।

উদারস্বভাব বৌদ্ধ ভূপতিদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে প্রধান প্রধান রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লোকে কোন প্রকার গুরুতর করভারে নিপীড়িত হইত না, কেহ কাহাকে অমনি খাটাইয়া লইত না। যাহারা অট্টালিকানির্ম্মাণে বা অন্য কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইত, তাহারা আপনাদের পরিশ্রমের হার অনুসারে বেতন পাইত। জনসাধারণ আপনাদের পুরুষানুগত স্বত্বে

কথনও বঞ্চিত হইত না। তাহারা আপনাদের ভরণপোষণের জন্য কৃষিকার্য্য করিত। কৃষক উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া অবশিষ্ট আপনারা রাখিত। বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে কুৎঘাটে সামান্য রকম কর দিতে হইত। সৈনিকেরা কেহ কেহ রাজ্যের সীমান্তভাগ, কেহ কেহ রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিত। প্রয়োজন অনুসারে সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইত। পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া, সাধারণকে সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত করা হইত।

রাজকীয় ভূমি হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত, তাহার চারি ভাগ হইত। এক ভাগ রাজ্য ও ধর্ম্মসম্মত কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ থাকিত; দ্বিতীয় ভাগ মন্ত্রীও শাসনসমিতির কর্ম্মচারিগণের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য দেওয়া যাইত; তৃতীয় ভাগ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাশালীদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য রাখা হইত; এবং চতুর্থ ভাগ "সন্তোষক্ষেত্রের" ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমা থাকিত। সমুদয় শাসনকর্ত্তা, শান্তিরক্ষক ও রাজকীয় কর্ম্মচারী, আপনাদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পাইতেন।

খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দীতে, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব ভারতের ইতি-সের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, বিভিন্ন রাজ্য আপনার বিজয়পতাকায় পরিশোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশী আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্র যখন আপনার অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমায় নালন্দার বিদ্যালয় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন মহারাজ

শীলাদিত্য হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এই মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফীটপরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহসমূহ বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। ভোজন-গৃহের এক একটিতে একবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয় দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শীলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও মিত্র রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ ধ্রুবপতি এবং আসামরাজ ভাস্করবর্ম্মা মিত্র রাজ-গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই দুই রাজা ও মহারাজ শীলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের পটবাস স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার সকল দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত।

ঐ ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। শীলাদিত্য আপনার সৈনিকগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্য স্থাপন করিতেন এবং ভাস্করবর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে স্বকীয় সৈনিকদল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের আরম্ভ হইত। শীলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দুদেবমূর্ত্তি, উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিনে পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিন সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথিঅভ্যাগতদিগকে প্রদত্ত হইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্য্যের আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ, দশ দিন, হিন্দুদেবতাপূজকগণ, এবং দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসিগণ দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন, দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শীলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা

হইত। চীরধারণ করিয়া, মহারাজ শীলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্যরক্ষা ও বিদ্রোহদমনের জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত। কথিত আছে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব মহামোক্ষপরিষদ নামে অভিহিত হইত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্রস্বভাব চীনদেশীয় শ্রমণ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন; এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভারতের প্রাচীন নৃপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজাগণ ধর্ম্মসঞ্চয়মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের ভূপতিগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদিগের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত; উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হই-তেন। এজন্য ইঁহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশলকামনা

করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই রাজ্যের উন্নতির উপায়নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এ দিকে সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিত। এই রূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। ইহা ভিন্ন যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজসিংহাসনগ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব প্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্যকীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ মুসলমানের পর ইংরেজের পদানত না হইত; যদি বৈদেশিক সভ্যতাস্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গতি প্রসারিত না করিত; ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন না দিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে এই প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত, এবং আজও এই অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকিত।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

মহামতি নানক বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, যে অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণ পূর্ব্বে যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে মুসলমান ভূপতিদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কষ্টের একশেষ হইল। ইহাদের অনেকে পশুর ন্যায় বধ্যভূমিতে নিহত হইতে লাগিল। এই নিদারুণ সময়ে শিখসমাজে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া, অধ্যবসায় ও উৎসাহসহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও সাহস, শিখদলে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল; এই অবধি মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শিখগণ মহাসত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ সর্ব্ব প্রথম শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সম্বদ্ধ করেন। গোবিন্দ সিংহের প্রতিভাবলে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের পরিপোষক। শিখগণ যে, তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহ তাহার মূল। তেজস্বিতায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায় শিখগুরুসমাজে

গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে, নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকমধ্যে, গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে লহনা নামক তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত শিষ্য অঙ্গদ নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক শিখদিগের গুরু হয়েন। অঙ্গদের পরে অমরদাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। পঞ্চম গুরুর নাম অর্জ্জুনমল। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা শিখদিগের গুরু হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানকের প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক আদিগ্রন্থ বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে চণ্ডু শাহ নামক এক ব্যক্তি লাহোরের রাজস্বসচিব ছিলেন। ইনি স্বকীয় কন্যার সহিত অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দের বিবাহের প্রস্তাব করেন। অর্জ্জুন এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। চণ্ডু শাহ তাঁহাকে লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে সম্মত হওয়াতে তিনি কহিয়াছিলেন—"আমার কথা প্রস্তরে ক্ষোদিত; উহা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। আপনি যদি আপনার কন্যার সহিত সমগ্র পৃথিবী দান করেন, তাহা হইলেও আমার পুত্র আপনার কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে না।" চণ্ডু শাহ ইহাতে নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের অনিষ্ট-সাধনে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে সম্রাট জাহাঁগীর লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন; অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন

বলিয়া চণ্ডু, সম্রাটের সমক্ষে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন। জাহাঁগীরের আদেশে, অর্জ্জুন কারাবদ্ধ হয়েন। ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে কারাগারে অসহনীয় যাতনায় সর্দ্দিগরমিতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের পর তৎপুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পিতার শোচনীয় মৃত্যুতে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের ঘোরতর বিদ্বেষ জন্মে। এ পর্য্যন্ত শিখগণ নিরীহভাবে কালযাপন করিতেছিল; অর্জ্জুনমলের দেহাত্যয়ে সে নিরীহভাব দূর হয়; প্রতিহিংসাবৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদা দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন, কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিতেন, "এক খানি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপর খানি মুসলমানদিগের শাসনের উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত হইতেছে।" হরগোবিন্দই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রবর্ত্তক। তাঁহার দেহান্তর হইলে তদীয় শিষ্যগণ এরূপ শোকবিমুগ্ধ হয় যে, একজন রাজপুত এবং একজন জাঠ শিখ গুরুর চিতাগ্নিতে নিপতিত হয়; এবং প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুর পদতলে দেহ বিসর্জ্জন করে। অপরেও এই রূপে আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হয়। কিন্তু গুরু হররায় তাঁহাদিগকে নিষেধ করেন।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র—গুরুদিত্য, সুরতসিংহ, তেগবাহাদুর, অন্নবায় ও অটলরায়। ইঁহাদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতে সর্ব্বজ্যেষ্ঠটির মৃত্যু হয়। শেষ দুই জন অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হয়েন এবং অবশিষ্ট দুই জন মুসলমানদিগের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদিত্যের দাহরমল ও হররায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে

দ্বিতীয়টি হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া গোলযোগের আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে ঐ গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয় পক্ষ দিল্লীতে গিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে মধ্যস্থ মানেন। সম্রাট্ অপ্রাপ্তবয়স্ক হরেকৃষ্ণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাক্‌চাতুরী দর্শনে প্রীত হইয়া, তাঁহাকেই গুরুর পদে মনোনীত করেন। কিন্তু দিল্লীত্যাগের পূর্ব্বেই ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। হরেকৃষ্ণ, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেগবাহাদুরকে আপনার উত্তরাধিকারী করেন।

হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাহা হউক, তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া দিল্লীতে আনীত হয়েন। পরিশেষে তিনি জয়পুররাজ জয়সিংহের অনুগ্রহে সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া, কিয়ৎকাল পাটনাতে অবস্থিতি করেন। এইস্থানে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে তদীয় পুত্র গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়।

তেগবাহাদুর পাটনা হইতে পঞ্জাবে গমন করিলে পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বরের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, তেগবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, আওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুদণ্ডব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে গমনসময়ে তেগবাহাদুর স্বকীয় তনয় গোবিন্দকে

পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বকএই কথা বলেন, যে, মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ যেন শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়। গোবিন্দ, পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। তেগ-বাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে সম্রাট্ অবজ্ঞা ও উপহাস সহকারে তাঁহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতে অনুরোধ করেন। তেগ-বাহাদুর ইহাতে গম্ভীরভাবে কহেন, "সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তথাপি একটি বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একখানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিতেছি। গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে স্থান স্পর্শ না করে।" তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বাঁধিয়া ঘাতকের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। নিমিষমধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, নিমিষমধ্যে তেজস্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে এবং এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দেখিয়া, দিল্লীর ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আওরঙ্গজেব সবিস্ময়ে, ভীতিবিহ্বলচিত্তে দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে——

"শির্ দিয়া সার না দিয়া।"

"মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না"

এইরূপে ১৬৭৫ অব্দে তেগবাহাদুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। এইরূপে তেগবাহাদুর লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীরভাবে ঘাতকের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্ম্মবীরের জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনী চিরকাল লোককে উপদেশ দিবে।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া, গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা শুনিয়াছ, আমার পিতা দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন। আমি এখন এই সংসারে একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কার্য্যে আমি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিব। পিতার দেহ এখন দিল্লীতে রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি, উহা আনিতে পারিবে না?" গুরুর এই কথায় একটি শিষ্য তেগ-বাহাদুরের দেহ আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ তাহাকে বিদায় দিলেন। শিষ্য দিল্লীতে যাইয়া, তেগবাহাদুরের দেহ লইয়া পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। এ দিকে দিল্লীতে শিখগণ যথাবিধি তেগবাহাদুরের মস্তকের সৎকার করিল।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দ সিংহের মনে এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, মুসলমানের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধার-সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি শিখদিগকে একটি মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া, জীবনের

উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসনকর্ত্তৃগণের সাবধানতাপ্রযুক্ত গোবিন্দ, পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঐ সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, তিনি যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়ায়, পারস্য ভাষার অধ্যয়নে এবং স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে, তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগলসাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, আওরঙ্গজেবের সমকালে তৎসমুদয় নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুতরাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবাজীর অত্যয়ে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। আওরঙ্গজেবের সময়ে শিবাজীই স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের রাজত্ব অনেকাংশে নিষ্কণ্টক হয়। শিবাজীর অভাবে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ প্রায় সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগলসাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় কুড়ি বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে গমন পূর্ব্বক এই শিষ্যদল লইয়া জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে উদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভুয়োদর্শন তাঁহার

বিচারশক্তি মার্জ্জিত করিয়াছিল এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার স্বভাব উন্নত করিয়াছিল; এক্ষণে একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিখদিগের হৃদয়ে তেজস্বিতা ও সাহসের সঞ্চার করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এই রূপে প্রবলপরাক্রম রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বের বিপর্য্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন, এবং মোগলের অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ও তেজস্বিতা লাভের জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃ-বর্গের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। কিরূপে মানুষের সুশিক্ষা হইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে মহাবল করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনীর কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, দৈত্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; সিদ্ধগণ কিরূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট এবং কিরূপ বিঘ্নবিপত্তির অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া, লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল।

তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন। এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বেদ পাঠ করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও, তিনি শারীরিক তেজস্বিতালাভে উদাসীন থাকেন নাই। তিনি নিকটবর্ত্তী নইনা নামক পর্ব্বতে গিয়া, অর্জ্জুনের বিক্রম, অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ আত্মসংযম এবং এইরূপ গভীর চিন্তায় শিখসমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, গোবিন্দ নইনা পর্ব্বতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি এই জন্যে বারাণসী হইতে এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। পর্ব্বতের শিরোদেশে হোমকুণ্ড নির্ম্মিত ও অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। কয়েক মাস কাল ঐ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অগ্নি এক দিনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। গোবিন্দ অবশেষে দুর্গার প্রীতিসাধন জন্য আপনার একটি পুত্রকে বলি দিতে ইচ্ছা করিয়া মাতৃদেবীর নিকটে চারি পুত্রের মধ্যে একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার মাতৃদেবী এবিষয়ে অসম্মত হওয়াতে তদীয় কোন শিষ্যকে বলি দিবার প্রস্তাব হয়। পাঁচ জন শিষ্য * গুরুর জন্য

* এই পাঁচ জন শিষ্যের নাম ধর্ম্ম সিংহ, সুখ সিংহ, দেব সিংহ, হিম্মৎ

আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইঁহাদের মধ্যে এক জনের ছিন্ন মস্তক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। গোবিন্দ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সাহায্যে এইরূপে হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। কথিত আছে, দুর্গা আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে কহেন—"যাও। তোমার সম্প্রদায় পৃথিবীতে শ্রীসম্পন্ন হইবে।" এই গল্পে শিখ-দিগের প্রগাঢ় গুরুভক্তি ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই জন শিখ গুরু হরগোবিন্দের চিতানলে দেহত্যাগ করিয়াছিল। গুরু হররায় কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ না হইলে আরও অনেকে ঐরূপে দেহত্যাগ করিত। গুরু গোবিন্দের জন্যেও শিষ্যগণ দেহ-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছিল। অসীম ভক্তির আবেগে এরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ বীরত্বপ্রসিদ্ধ জাতির মধ্যে শিখদিগকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখসমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মাখোয়ালনামক স্থানে শিখদিগকে আহ্বান করিলেন। এক পক্ষের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার শিখ তথায় সমবেত হইল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃ-করণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না। কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে

সিংহ, ও মাখন সিংহ। ইঁহাদের কাহার মস্তক দেবীকে বলিস্বরূপ দেওয়া হয়, তাহার নির্দ্দেশ নাই। অনেকের বিশ্বাস, এই হোমে প্রকৃতপ্রস্তাবে নরবলি হইয়াছিল।

না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে; সকলেই এক পঙ্ক্তিতে এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা কহিয়া, স্বহস্তে এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন ক্ষত্রিয় ও তিন জন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে খাল্‌সা* বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক 'সিংহ' উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও ঐ উপাধি ধারণ করিয়া, গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া, শিখদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চবর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দসিংহের তেজস্বিতা ও কার্য্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজো-মহিমা দর্শনে বাঙ্‌নিস্পত্তি না করিয়া, যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদি গুরু নানক এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল; রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে

* আরব্য ভাষা হইতে "খাল্‌সা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উহার অর্থ, পবিত্র, বিমুক্ত। যে ভূমির সহিত অপরের কোনও সংশ্রব নাই, সচরাচর সে ভূমি খাল্‌সা নামে অভিহিত হয়। গুরু গোবিন্দ হইতেই শিখদিগের সংজ্ঞা "খাল্‌সা" ও উপাধি "সিংহ" হয়।

বিশেষিত হইয়া, দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, প্রকৃত যোদ্ধার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল। "ওয়া! গুরুজি কা খাল্‌সা! ওয়া! গুরুজি কি ফতে!" (খাল্‌সা গুরুর; জয়শ্রী গুরুকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠনামক একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসারে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখসমাজ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ বিষয়সুখে আপনার নিস্পৃহতা দেখাইবার জন্য এবং শিষ্যদিগকে ভোগবিলাস হইতে দূরে রাখিয়া অভীষ্ট বিষয়-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, নিজের সমস্ত সম্পত্তি শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। কথিত আছে, একদা এক জন শিষ্য সিন্ধুদেশ হইতে প্রায় ২৫,০০০ টাকামূল্যের দুই খানি সুন্দর হস্তাভরণ আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া, অগত্যা উহা হস্তে ধারণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে গিয়া, ঐ আভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য, গুরুর এক হাত আভরণশূন্য দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ কহিলেন, "একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ইহা শুনিয়া একজন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল যে, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ডুবরী সম্মত

হইল। শিষ্য কোন্ স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জন্য, গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "ঐখানে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ভোগসুখে গুরুর এই রূপ অসাধারণ ঔদাস্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর আদেশপালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দ সিংহ বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ধীরভাবে ও সংযতচিত্তে শিখসমাজ সংগঠিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, উদাসীনভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া, এই অভিনব সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা অসিদ্ধ রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগল-দিগের মধ্যে সশস্ত্র খাল্‌সাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান-দিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দসিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃসমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া, পিতৃহন্তা অত্যাচারী মোগলদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগলশাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগলসাম্রাজ্যে প্রায়ই গোলযোগ ঘটিত। মোগলসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র হুমায়ূন পাঠানবংশীয় শের শাহের পরাক্রমে

রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোল বৎসর কাল যাপন করেন। অকবর যদিও রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল, ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন, যদিও তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অসদ্ভাব অনেকাংশে তিরোহিত হয়, তথাপি তাঁহাকে স্বকীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহারে এবং বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শাহজহাঁ জীবদ্দশাতেই, সিংহাসন লইয়া, পুত্রদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে আবদ্ধ হয়েন। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কঠোর ব্যবহারে অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। অকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যত্ন করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাদের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মাইয়া দেন। তিনি নিজের সন্দিগ্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে রাজপুতগণ স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; অপর দিকে শিবাজী বিধর্ম্মীর শাসনে বিরক্ত হইয়া, স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ তেজস্বিতা দেখাইয়া, জাঠদিগের মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য আপনার শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে বিভক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও শিক্ষিত শিষ্যগণের উপর এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। গোবিন্দসিংহ এই আদেশ প্রচার

করিলেন যে, যে পরিবারে চারিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকিবে, সেই পরিবারেরই দুইটি পুরুষ তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। শিখসমাজে গোবিন্দসিংহের নিরতিশয় সম্মান ছিল। গোবিন্দসিংহ শিষ্যদিগের মধ্যে দেবভাবে সম্পূজিত হইতেন। সুতরাং শিখগণ তাঁহার আদেশানুসারে তদীয় কার্য্যসাধনে উদ্যত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের পাদদেশে তিনটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পবন্তনামক স্থানে তাঁহার একটি সেনানিবাস ছিল। এই সেনানিবাস ব্যতীত আনন্দপুরনামক স্থানে তাঁহার পিতৃ-দেবের প্রতিষ্ঠিত আর একটি আশ্রয়স্থান হস্তগত হইল। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয়স্থান চম্পকুমার; উহা শতদ্রুর তটে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করার সুবিধা ভাবিয়া, গোবিন্দ সিংহ অগ্রে ঐ দুর্গ ও সেনানিবাসসমূহ সুরক্ষিত করিলেন এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্দ্দারদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধ করিবার আয়োজন করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া, নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সেনানিবাস নিরাপদ করিতে ও দুর্গসমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নপর হইলেন।

নাহন, ইন্দোর, নালাগড় প্রভৃতি পার্ব্বত্য জনপদের রাজাদিগের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাকী পড়াতে,

তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য, শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। নালাগড়ের রাজার সহিত যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখগুরুর কৃত কার্য্যতা দর্শনে অনেকে তাঁহার দলভুক্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে মিয়া খাঁ নামক এক জন মোগল সর্দ্দার কাহলূরের ভীমচাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কাহলূর রাজ্য শ্রীনগরের উত্তরপশ্চিমে ও জম্বুর দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। জম্বুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীমচাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ, সৈনিকগণের সহিত ভীমচঁদের সাহায্যার্থে সমরস্থলে উপনীত হয়েন। এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমচাঁদের জয়লাভ হয়। মোগল সর্দ্দার ও জম্বুরাজ পরাজিত হইয়া, পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহাকেও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। দিলির খাঁ পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া, সমুদয় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটি দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়, কিন্তু শেষে হুসেন খাঁ পরাজিত ও নিহত হয়েন। গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না; তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

পার্ব্বত্য প্রদেশের ভূপতিগণের নিকটে গোবিন্দ সিংহের এই রূপ পরাক্রমের বিবরণ শুনিয়া, আওরঙ্গজেব লাহোর ও সর্হিন্দ প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে উহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর

ভাবে আদেশ করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সবিশেষ আয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মাজ্জমও ইঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদে শিখগণের অনেকে ভীত হইয়া, সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে চল্লিশ জন সাহসী শিখ, গুরুর জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরমাখোয়াল নামক স্থানে মোগল সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা তদীয় দুইটি শিশু সন্তানের সহিত সর্হিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ইঁহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। ইঁহারা সর্হিন্দের শাসনকর্ত্তার হস্তে পতিত হইলেন। এই শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি গোবিন্দ সিংহের জননী ও পুত্রদ্বয়ের প্রাণসংহারে সম্মত হইলেন না। তাঁহার দেওয়ান পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। একদা গোবিন্দসিংহের পুত্রদ্বয় দরবারে উপস্থিত ছিল। নবাব তাহাদের সুদর্শন আকৃতি ও কমনীয় মাধুরী দেখিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালকগণ! যদি তোমাদের মুক্তি লাভ হয়; তাহা হইলে তোমরা কি করিবে?" বালক দুইটি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আমাদের শিখদিগকে একত্র করিব; তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দিব; যুদ্ধ করিয়া, আপনাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিব।" নবাব কহিলেন, "যদি তোমাদের পরাজয় হয়?" বালকেরা পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে ও বীরত্বব্যঞ্জকস্বরে কহিল, "তাহা হইলে আবার

সৈন্য সংগ্রহ করিব; এবং হয় আপনাদিগকে বধ করিব, নয় আমরাই নিহত হইব।" নবাব বালকদিগের এইরূপ তেজস্বিতা দর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে দেওয়ানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেওয়ান তাহাদের প্রাণসংহার করিল। গোবিন্দ সিংহের জননী উহাদের শোকে দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপ শোচনীয় ঘটনায় গোবিন্দ সিংহ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিরস্ত হইলেন না। তিনি উক্ত চল্লিশ জন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত রাত্রিকালে মোগল সৈন্যের অগোচরে চম্পকুমারে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজা মহম্মদ ও নহর খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া, এক জন দূত পাঠাইলেন, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র জিৎসিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া, দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া, শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। জিৎসিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী এবং আর একটি পুত্র বিপক্ষের হস্তে নিহত হইলেন। গুরুর স্ত্রীপুত্র নিহত হওয়াতে শিষ্যগণ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। গুরু অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে দুইটি সমানান্তরাল রেখা টানিয়া, হস্তদ্বারা উহা মুছিয়া ফেলিলেন; অনন্তর শিষ্যদিগকে কহিলেন, "ভাই শিখগণ! যখন এই রেখার আবির্ভাব হইল, তখন আহ্লাদের কোন কারণ দেখা গেল না। যখন ইহা বিলুপ্ত হইল, তখনও

শোকের কোন কারণ পরিদৃষ্ট হইল না। এই রেখা যেমন অস্থায়ী, সেইরূপ দুঃখপূর্ণ পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারই ধ্বংসশীল। ঈশ্বর সৃষ্টি ও সংহার করেন। ইহার জন্য আমাদের শোকের কারণ কি? তাঁহার উপর নির্ভর কর। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্! সামান্য মানব—আমরা তাঁহার সমক্ষে কিছুই নই।" গুরুর এইরূপ দৃঢ়তা দর্শনে শিষ্যগণ শোকসংবরণ করিয়া, বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

গোবিন্দ সিংহ স্বহস্তে নহর খাঁকে নিহত এবং খোজা মহম্মদকে আহত করিয়া, চম্পকুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থানসময়ে দুই-জন পাঠান তাঁহাকে দেখিতে পায়। উহারা পূর্ব্বে গোবিন্দ সিংহের নিকটে উপকার পাইয়াছিল, এজন্য উপস্থিত সময়ে তাঁহার বিশিষ্ট সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বহ্‌লূলপুরনগরে উপনীত হয়েন। এই স্থানে পীর মহম্মদ নামক এক জন কাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর মহম্মদের নিকটে এক সময়ে কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; পীর মহম্মদ এজন্য তাঁহার প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ,ঐ স্থান হইতে ছদ্মবেশে ভাতিণ্ডানামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপনীত হয়। গোবিন্দ সিংহ প্রায় ১২হাজার সৈনিকের অধিনায়ক হয়েন। সর্হিন্দের শাসনকর্ত্তা তাঁহার দল বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ৭ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। ফিরোজ-পুর বিভাগের অন্তর্গত মুক্তসরনামক স্থানে ইহারা পরাজয় স্বীকার করে। গোবিন্দ সিংহের আদেশে যুদ্ধস্থলে একটি জলাশয়খনন হয়। এই জলাশয় মুক্তসর নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করে। মুক্তসর শিখদিগের একটি তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাদের মতে এই সরোবরে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিনে জলাশয়ের তটে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভের স্মরণার্থে একটি মেলা হয়। শিখগণ পঞ্জাবের নানা স্থান হইতে তথায় সমবেত হইয়া থাকে।

ইহার পর কিয়ৎকাল শান্তভাবে অতিবাহিত হয়। গোবিন্দ সিংহ ভাতিণ্ডার নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার বাসগৃহ দমদমা নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানেও প্রতিবৎসর শিখদিগের একটি মেলা হইয়া থাকে। শিখদিগের বিশ্বাস যে, দমদমা দর্শন করিলে তাহাদের জ্ঞানলাভ হয়। দমদমায় অবস্থিতিকালে গোবিন্দ সিংহ "বিচিত্র নাটক" এবং এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এই জন্য তৎপ্রণীত ধর্ম্ম-পুস্তক "দশম পাতসা কা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদয়ের বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার জন্য রাহৎনামা নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দ সিংহ দমদমা হইতে সর্হিন্দে উপনীত হয়েন। এই স্থানে তাঁহার দুইটি শিশু পুত্র মুসলমান শাসনকর্ত্তার আদেশে নিহত হইয়াছিল। তদীয় ভক্তিপরায়ণ শিষ্যগণ এজন্য সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, গুরুকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল—"মহারাজ! আমাদিগকে এই নগর ভস্মীভূত করিতে আদেশ দিন। আমরা আর এই নগর দেখিতে পারি না। এই স্থানেই আপনার দুইটি স্নেহাস্পদ পুত্র নিহত হইয়াছে।" গোবিন্দ সিংহ উত্তর করিলেন—

"নগরের কোন দোষ নাই। উহা বিধ্বস্ত হইলে আমার পুত্র-দ্বয়ের হত্যার প্রতিশোধ হইবে না।" কিন্তু শিষ্যগণ ইহাতেও সাতিশয় উত্তেজনা প্রকাশ করিলে, গোবিন্দ সিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"আমার যে কোন শিখ এই স্থান হইতে গঙ্গাতটে যাইবে, সে নিরীহ বালকদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডে বিরক্তি দেখাইবার জন্য এই নগরের দুইখানি ইষ্টক লইয়া, শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিবে, এবং অদ্য হইতে এই স্থান "গুরুমার" (যে স্থানে গুরু নিহত হইয়াছেন) নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই নিয়ম অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে। গঙ্গাতটে গমনাগমন সময়ে তীর্থযাত্রিগণ সর্হিন্দ হইতে দুই খানি ইট লইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে সর্হিন্দের নাম উচ্চারণ করা শিখদিগের মতে অমঙ্গল-জনক। শিখগণ এই স্থানে একটি মঠ নির্ম্মাণ করে। অনেক যাত্রী এই মঠ দর্শন করিয়া থাকে।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর নামক স্থানে শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব এই সময়ে দক্ষিণাপথে ছিলেন। তিনি গোবিন্দ সিংহের ক্ষমতার যথোচিত পরিচয় পাইয়াছিলেন। এসময়ে মোগল সম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি স্বপ্রধান হইতেছিলেন। সম্রাট্ দক্ষিণাপথের যুদ্ধে নিরতিশয় বিব্রত হইয়াছিলেন। এখন ক্ষমতাশালী শিখগুরু বৃদ্ধ সম্রাটের চিন্তার বিষয়ীভূত হইলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে আপনার নিকটে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সর্ব্বপ্রথম এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি আপনার অবস্থা সম্বন্ধে পারস্যভাষায় একখানি কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করেন। এই

পুস্তকে চৌদ্দশত কবিতা লিখিত হয়। তিনি স্বরচিত কবিতায় এইরূপে আত্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেনঃ—"খাল্‌সাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ দিবে। অর্জ্জুন ও তেগ-বাহাদুরের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে। আমার স্নেহময়ী মাতা, প্রিয়তমা প্রণয়িনী, প্রাণাধিক পুত্রগণ অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি এক্ষণে কোনরূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই; স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন।" গোবিন্দ সিংহের এক জন বিশ্বস্ত অনুচর এই মর্ম্মবেদনাজ্ঞাপক কাব্য লইয়া সম্রাটের সমক্ষে উপনীত হয়েন। সম্রাট্ যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া, তাঁহাকে সম্মানসহকারে বিদায় দেন। কিন্তু তিনি গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনর্ব্বার সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রিঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মাজ্জম "বাহাদুর শাহ" নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর শাহ যখন দক্ষিণাপথে তদীয় ভ্রাতা কাঁমবক্সের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি গোবিন্দ সিংহকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। গোবিন্দ সিংহ উপস্থিত হইলে, বাহাদুর, তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য দেখাইয়া, তাঁহাকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে এক জন পাঠান

তাঁহার নিমিত্ত কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করে। ঘোটকের মূল্য দিতে বিলম্ব হওয়াতে, পাঠান এক দিন গোবিন্দ সিংহকে কঠোর ভাষায় ভৎসনা করে। গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া, তরবারির আঘাতে পাঠানের শিরশ্ছেদ করেন। এই পাঠান তাঁহার প্রিয় পাত্র ছিল। তিনি প্রিয় পাত্রের এইরূপ পরিণামে নিরতিশয় অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েন এবং তাহার বিধবা পত্নী ও পুত্রদিগকে আনাইয়া,তাহাদিগকে অর্থ দান করেন। কিন্তু নিহত পাঠানের পুত্রগণ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিতে নিরস্ত থাকে নাই। একদা তাহারা গোবিন্দ সিংহের বাসগৃহে লুক্কায়িত থাকিয়া, সুযোগক্রমে তাঁহার উদরে শস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতে গোবিন্দসিংহের মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, পাঠানবালকেরা দ্রুতগতি প্রস্থান করে। কিন্তু উহাতে গোবিন্দসিংহের মৃত্যু হয় নাই। তিনি আহত হইয়াই, "ও ভাই শিখগণ! আমি মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার চীৎকারে শিখগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার সমক্ষে উপনীত হয়। চারি দিকে আঘাতকারীর অনুসন্ধান হইতে থাকে। অবিলম্বে তাহারা ধৃত ও গোবিন্দ সিংহের নিকটে আনীত হয়। কিন্তু গোবিন্দসিংহ শিষ্যদিগকে পাঠানবালকদিগের অনিষ্ট করিতে নিষেধ করেন। যে হেতু, তাহারা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিয়া, ভাল কাজ করিয়াছে। বালকেরা শিখগুরুর অনুকম্পায় অক্ষতশরীরে প্রস্থান করে।

অবিলম্বে ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। গোবিন্দ সিংহ ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি মানসিক শান্তির অধিকারী হইতে পারেন নাই। পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি মৃত্যুকে হৃদয়ঙ্গম সুহৃৎ বলিয়া

আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়েন। একদা এক খানি সুদৃঢ় শরাসন তাঁহার পরিদর্শনের জন্য আনীত হয়। তিনি সাতিশয় বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ শরাসন আনত করেন। এই সময়ে তাঁহার ক্ষতস্থান ভালরূপে শুষ্ক হয় নাই। সবলে শরাসন আনত করাতে ক্ষতস্থান হইতে প্রবলবেগে রুধিরস্রোত নির্গত হয়। দিল্লী হইতে এক জন হাকিম আসিয়া, তাঁহার ক্ষতের প্রতীকারে নিয়োজিত হয়েন। কিন্তু ইহাতে শিখগুরু শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পাল্কীতে চড়িয়া দক্ষিণ দিকে গমন করেন। গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদরনামক স্থানে উপনীত হইলে তাঁহার দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি হয়। তখন তিনি অনুচরদিগকে কহিলেন, তাঁহার মৃত্যুসময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ঔষধের বা স্থানান্তরে গমনের আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রদিগকে অর্থদান করা উচিত। গুরুর এই আদেশে শিষ্যগণ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে আহারীয় দ্রব্যে ও অর্থে পরিতোষিত করিল। ইহার পর গুরু তাঁহার সৎকারের আয়োজন করিতে কহিলেন। শিষ্যগণ গুরুর এই আদেশে সজলনয়নে ও করপুটে কহিল—"গুরু যখন অন্তর্হিত হইতেছেন, তখন কে তাহাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইবে; কে তাহাদিগকে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য পরিচালিত করিবে এবং কে তাহাদিগকে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র বুঝাইয়া দিবে?" গোবিন্দ তাহাদিগকে করুণাময় ঈশ্বর এবং পবিত্র গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে বলিলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশে শিষ্যগণ তাঁহাকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইল। গোবিন্দ সিংহ আপনার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"আমাকে এই বস্ত্র ও অস্ত্রের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে।" ইহা কহিয়া, তিনি প্রশান্ত

ভাবে স্বয়ং চিতায় উঠিয়া শয়ন করিলেন এবং
যোজনা করিয়া, পবিত্র গাথার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। উহার ভাবার্থ এই :—

"আমি যখন তোমার পদানত হইয়াছি, তখন হইতেই আমার দৃষ্টি তোমার দিকে স্থিরভাবে রহিয়াছে। হে রাম! হে রহিম! (কৃপালু) পুরাণ এবং কোরাণ নানাবিধ প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকে। কিন্তু আমি তৎসমুদয়ে মনোনিবেশ করি নাই। স্মৃতি, দর্শন, বেদ, সমুদয়ই নানাবিধ প্রণালীর উপদেশ দেয়। আমি তৎসমুদয়ের কোনটিই মানি নাই। হে ঈশ্বর! তোমার করুণা এরূপ যে, আমি হস্তস্পর্শে তোমাকে জানিতে না পারিলেও, তোমাকে সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।"

আবৃত্তি শেষ হইলে গোবিন্দের নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল। গোবিন্দ নিমীলিতনেত্রে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলেন।

এই রূপে দশম গুরু গোবিন্দসিংহ ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭০৮ খ্রিঃ অব্দে লোকান্তরিত হয়েন। গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি ৩০ বৎসর ১১ মাস শিখসমাজে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগ হইলে শিখগণ দলে দলে ঐ স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। তাহাদের জয় জয় রবে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইল। স্তবপাঠে,ভজনে,পরমভক্ত শিষ্যদিগের শোকোচ্ছ্বাসে গুরুর শ্মশানভূমি অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবক্ষেত্র হইয়া উঠিল। শিষ্যগণ এরূপ শোকাতুর হইয়াছিল যে, কথিত আছে, তাহাদের কেহ কেহ শোকের আবেগে দেহ ত্যাগ করে। যাহা হউক, এই স্থলে গুরুর সমাধিমন্দির এবং একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়।

সমাধিমন্দির শিখদিগের পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। নাদরের অর্দ্ধমাইল দূরে এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরে অনেক তরবারি, ঢাল, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র রহিয়াছে। ধর্ম্মনিষ্ঠ সেবকগণ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা অর্থের জন্য শিখসমাজে পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র হুকুমনামা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিখগণ হুকুমনামা পাইলে আপনাদের অবস্থানুসারে অর্থ দিয়া থাকে।

গোবিন্দ সিংহ অতিশয় তেজস্বী ছিলেন। তিনি বীরত্বের সহিত যথোচিত লিপিক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। তিনি যেমন সুকবি, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বীর পুরুষের বীরত্ব, নারীজাতির কুটিলভাব, এই কুটিলতার অনিষ্টকারিতা, সামাজিক স্বাধীনতা প্রভৃতি তাঁহার উদ্দীপনাময়ী কবিতার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। নানকসংহিতা —আদিগ্রন্থের সংস্কার করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। গুরু অর্জ্জুনের স্বাক্ষরসম্বলিত এই সংহিতা করতারপুরে ধর্ম্মনিষ্ঠ শিখদিগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতেছিল। গোবিন্দসিংহ সংহিতা আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু করতার-পুরের শিখগণ গোবিন্দ সিংহের মতবিরোধী ছিলেন বলিয়া, উহা দিতে সম্মত হয়েন নাই। তাঁহারা উপেক্ষার সহিত কহিয়া-ছিলেন—যে গুরু আপনাকে "প্রকৃত অধিপতি" বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার যদি সংহিতাকারের ন্যায় প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং এক খানি সংহিতা লিখিতে পারেন।" এই কথায় গোবিন্দ সিংহের এরূপ অভিমান হয় যে, তিনি

দমদমায় অবস্থিতিকালে এক খানি স্বতন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থই "দশম পাতসা কা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রাচীন হিন্দী-ভাষার রীতি অনুসারে ইহা লিখিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ শিখসমাজের জীবনদাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাবল বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে, নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই জন্যেই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন; এই জন্যেই তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে এক সূত্রে নিবদ্ধ করেন, এবং এই জন্যেই তিনি গর্ব্বসহকারে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে লিখেন—"তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখগুরুর এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

হরগোবিন্দ শিখসমাজে অস্ত্রব্যবহারের প্রবর্ত্তক। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সেই অস্ত্রের সহিত এমন তেজস্বিতা প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে শিখগণ তেজস্বী, সাহসী ও সুযোদ্ধা বলিয়া ইতিহাসের আদরণীয় হইয়াছে। গোবিন্দ সিংহ অতি তরুণবয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি আরও কিছুদিন জীবিত

থাকিলে, অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস, বোধ হয়, বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। গোবিন্দ সিংহ আপনার মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত না হইলে, শিখদিগের নাম বোধ হয়, ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়সে, অল্প সময়ের মধ্যে, শিখসমাজে যে জীবনীশক্তি ও তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই জন্যে, নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে; তাহারই জন্যে রামনগর ও চিনিয়াবালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দ সিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার নাম ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে। যখন জনকোলাহলপূর্ণ সুদৃশ্য নগর বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে; যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ, অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীনপরাক্রম বিদেশীর বিজয়পতাকায় শোভিত হইবে; যখন বিশালতরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ বেগবতী নদীর আকার ধারণ করিয়া, জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে; তখনও গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উদারতা অবনীতলে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের নাম ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

ভারতে মুদ্রণস্বাধীনতা।

মুদ্রণস্বাধীনতার বিবরণ সভ্যতার ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতে এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অক্ষয় ও অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইংলণ্ড অপ্রতিহত-প্রতাপে বিশাল বারিধি লঙ্ঘন এবং সমুন্নত পর্ব্বত ও ভয়াবহ অরণ্য অতিক্রম করিয়া, নানা দেশে আপনার বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রতাপ প্রথমে ধীরে ধীরে ভারতের এক দেশে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে নীরবে গতি প্রসারিত করে, পরিশেষে বাধাপ্রভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়া, ভারতের সমুদয় স্থান অধিকারপূর্ব্বক আপনার মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে নবীন উপাদানে নবীনতর করিয়া তুলিয়াছেন। আজ যে উন্নতির তরঙ্গ ভারতের চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে, সেই উন্নতির মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, উচ্চশিক্ষা ও মুদ্রণস্বাধীনতাদান ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান সৎকার্য্য। এই সৎকার্য্যে ইংরেজ ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ভারতবাসী ইংরেজের কৃত এই উপকার কখনও ভুলিতে পারিবে না, এবং কখনও এই উপকারের অসম্মান বা অগৌরব করিয়া, আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিবে না।

ভারতে মুদ্রণস্বাধীনতার ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিচিত্র, ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন কালে অন্যান্য দেশে এ সম্বন্ধে কি কি নিয়ম ছিল, সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের

উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাতে উপস্থিত বিষয়ের বৈচিত্র্য অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

অতি প্রাচীন কালে ব্যবস্থাপকগণ সমাজরক্ষার্থে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কঠোর বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন গ্রীস ও স্পার্টা প্রভৃতি দেশে ইহার উদাহরণ বিরল নয়। লাইকরগস্ প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণের মতে সামান্য চৌর্য্যাদি অপরাধেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছেদন বা প্রাণদণ্ডাদি অবিহিত ছিল না। তৎকালের লোকে সকল সময়ে বীরত্ব-প্রদর্শনের জন্য উগ্র প্রকৃতির পরিচয় দিত বলিয়াই হউক, বা তদানীন্তন সমাজ মার্জ্জিতবুদ্ধিমূলক উৎকৃষ্ট বিধির যোগ্য হয় নাই, এই ভ্রান্তিতেই হউক, অনেক নিষ্ঠুর বিধি প্রণীত এবং অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সক্রেতিস এই নিষ্ঠুরতায় ও অনুদারতায় হেমলকপানে মানবলীলাসংবরণ করিয়াছিলেন এবং গালিলিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নীরবে, গম্ভীরভাবে জগতের কার্য্যকারণচিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সৎকর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র শূদ্রদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনে উদাসীন থাকেন নাই।

পূর্ব্বে পুস্তকপত্রিকাপ্রভৃতির প্রচার সম্বন্ধেও কঠোর নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইত। গ্রীস ও রোম প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যগণের সমধিক উদারতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ কঠোর নিয়মের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই গ্রন্থপ্রণয়ন ও নিয়মব্যবস্থাপনের

ভার ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রভুত্বের পরিসীমা ছিল না। কেহই তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারা যে গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজাকে তাঁহাদের শাসন অনুসারে চলিতে হইত। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। এই অবিসংবাদিত আধিপত্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। লব্ধশক্তি ব্যক্তি মাত্রেরই এই অনিচ্ছা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। এই অনিচ্ছাপ্রযুক্ত তাঁহারা রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া, স্বমতবিরোধী গ্রন্থলেখকদিগের দণ্ড বিধান করিতেন না। তাঁহারা এ পথে না গিয়া, স্বয়ং বিরুদ্ধবাদী চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির মত খণ্ডন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে অনাদৃত ও অপ্রচলিত করিবার চেষ্টাকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন। এই চেষ্টা হইতেই বোধ হয়, দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পাঠে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে এথেন্স নগরই বিদ্যা, বুদ্ধি, মনস্বিতা ও তেজস্বিতাদি গুণে অন্যান্য নগর অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। এই এথেন্সে দেখিতে পাওয়া যায়, দুই প্রকারের লেখা মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। এক, প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী; অপর, ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর। সুপ্রসিদ্ধ প্রেতগোরসের গ্রন্থ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রেতগোরস কোন একটি বিষয় লিখিতে গিয়া প্রথমেই কহিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্বসম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। ঐশ্বরিক তত্ত্বে এইরূপ

অনভিজ্ঞতা অপরাধে খ্রিঃ পূঃ ৪১১ অব্দে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হয়েন, এবং তাঁহার গ্রন্থ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ও ভস্মীকৃত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ কতকগুলি সংযোগান্ত নাটক। এই সকল গ্রন্থে * জীবিত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র অতি কুৎসিত-ভাবে বর্ণিত হইত। এজন্য আইন অনুসারে ইহার অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। অভিনয় নিষিদ্ধ হইলেও গ্রন্থ গুলি পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই ছিল। উহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় নাই। লোকে ঐ সকল নাটক অভিনয় করিতে পারিত না বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পারিত। প্লেতো অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার এক জন প্রধান শিষ্যকে এই শ্রেণীর এক খানি অপকৃষ্ট নাটক পাঠ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং এন্তিয়ক নগরের প্রসিদ্ধ বাগ্মী, গ্রন্থকার ও ধর্ম্মপ্রচারক ক্রাইসস্তোম অসঙ্কুচিত-চিত্তে প্লেতোর অনুমোদিত উক্ত নাটকের অধ্যয়নার্থে অনেক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।

এথেন্সবাসীরা এইরূপে স্বরাজ্যপ্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী ও ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থাদিপ্রচারের নিষেধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের দুর্নীতিবিধায়ক গ্রন্থাদির প্রতি তাহারা তাদৃশ কঠোর ভাব প্রদর্শন করে নাই।

* বিয়োগান্ত নাটকের অনেক পরে এথেন্সে সংযোগান্ত নাটকের উন্নতি হয়। খ্রিঃ পূঃ ৪৬০ অব্দ পর্য্যন্ত এথেন্সে এ বিষয়ের এক জনও প্রধান কবি বর্ত্তমান ছিলেন না। মাগনেস্, ক্রাতিনস্ প্রভৃতি কবি খ্রিঃ পূঃ ৪৬০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আরিস্তোফেনেসের কাব্য খ্রিঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে লিখিত হয়। এই সকল কবির প্রণীত সংযোগান্ত নাটক গ্রীসে অভিনীত হইত।

এপিকিউরীয়দিগের ভোগতৃষ্ণা, কাইরিনেয়িকদিগের দৈহিক সুখেচ্ছা ও কাইনিকদিগের * অসামাজিক দুরাচারের দমনে এথেনীয়দিগের কঠোর বিধি প্রয়োজিত হইত কি না, ইতিহাস তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বী রহিয়াছে। পুরাবৃত্তের এইরূপ নীরব-ভাবে বোধ হয়, পূর্ব্বে এথেন্স নগরেও এই সকল সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত ও অশ্রদ্ধেয় মতের সমর্থক গ্রন্থসমূহ প্রচলিত ছিল।

স্পার্টা শাস্ত্রানুশীলনবিষয়ে এথেন্সের ন্যায় উন্নত ছিল না। স্পার্টাবাসিগণ কেবল সামরিক কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত। অসামান্য

*এপিকিউরস্ খ্রিঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া খ্রিঃ পূঃ ২৭০ অব্দে মানবলীলাসংবরণ করেন। তিনি মনে করিতেন, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দেবদেবীগণও পরমাণুসমষ্টি। তাঁহারা সর্ব্বদা সুখে কালাতিপাত করেন। সুখের হানি হয় বলিয়া, তাঁহারা পৃথিবীর বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি মিলটন উল্লেখ করিয়াছেন, শারীরিক সুখ অযত্নসম্ভূত স্বচ্ছন্দতাই এপিকিউরসের সার ধর্ম্ম। এপিকিউরসের মতা-বলম্বীদিগকে “এপিকিউরীয়” কহে।

কাইরেনবাসী আরিস্তিপাস্ “কাইরিনেয়িক” সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার মতে শারীরিক সুখসম্ভোগ লজ্জাকর নহে। কিন্তু যখন তখন উহা পরিত্যাগ করিতে না পারাই অত্যন্ত লজ্জাকর। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, উভ-য়ই সমভাবে মানব জাতির সুখোৎপাদনে সমর্থ। আরিস্তিপাস খ্রিঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

সক্রেতিসের এথেন্সবাসী আন্তিস্থিনেসনামক এক জন শিষ্য “কাইনিক” সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এথেন্স্ নগরে “কাইনোসার্গস” নামে একটি ব্যায়ামশিক্ষাগার ছিল। আন্তিস্থিনেস এই শিক্ষাগারে বিদেশিনীর গর্ভ-জাত সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। “কইনোসার্গস্” বিদ্যালয় হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম “কাইনিক” হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের রীতিপদ্ধতি কুকুরের আচারের ন্যায় ছিল ; এই জন্য ইহাদিগকে “কাইনিক” বলিত। কাইনিকদিগের মত ও ষ্টোয়িকদিগের মত প্রায় এক প্রকার।

বীরত্ব, অলৌকিক সাহস, অতুল্য রণশিক্ষায় স্পার্টা আজ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সমরব্যবসায়ই স্পার্টাবাসীদিগকে শাস্ত্রানুশীলনে একরূপ বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রানুশীলনচেষ্টাও ইহাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হয় নাই। লাইকর্গস নিজে বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যার মর্য্যাদারক্ষক ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম হোমরের মহাকাব্য আয়োনিয়া হইতে গ্রীসে আনিয়া প্রণালীবদ্ধ করেন; এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম স্পার্টাবাসীদিগের যুদ্ধোন্মত্ত কঠোর হৃদয় সুমধুর সঙ্গীতের আলোচনায় মৃদুল ও সভ্যতার নিয়মে প্রশস্ত করিবার অভিপ্রায়ে থেলস্‌নামক এক জন কবিকে ক্রীট দ্বীপ হইতে স্পার্টায় পাঠাইয়া দেন। লাইকর্গসের ঈদৃশী ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও স্পার্টাবাসীরা আপনাদের চিরাচরিত কয়েকটি বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই তাদৃশ আসক্ত ছিল না। সুতরাং স্পার্টায় গ্রন্থাদির প্রচার সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়মব্যবস্থাপনের প্রয়োজন হয় নাই। স্পার্টার লোকে এক বার আর্কিয়োলোকাস্‌নামক এক জন কবিকে আপনাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করে। আর্কিয়োলোকাস যে সমস্ত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্পার্টাবাসীদিগের সামরিক সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কারণে নির্ব্বাসনদণ্ড বিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কবিতার অশ্লীলতাদোষই তাঁহার নির্ব্বাসনের কারণ। এই নির্দ্দেশ সমীচীন বোধ হয় না। যেহেতু, স্পার্টার সমাজে ধর্ম্মনীতির বন্ধন তাদৃশ দৃঢ়তর ছিল না। ইউরিপিদেস্‌নামক এক জন কবি স্পার্টার মহিলাদিগকে

লজ্জাহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই*। যে সমাজে লজ্জাশীলতার তাদৃশ গৌরব নাই,সে সমাজে কোন কবির রচিত কবিতার কোন স্থলে দূষিত ভাব থাকাতেই যে, তাঁহার নির্ব্বাসন রূপ গুরুতর দণ্ড হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, গ্রীসদেশে যে প্রকারের লেখা আইনে নিষিদ্ধ ও দণ্ডার্হ ছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। রোমে এই বিষয়ে কিরূপ প্রতিষেধবিধি ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত রোমেও বিদ্যাচর্চ্চার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। বীররস সর্ব্বপ্রথম স্পার্টাবাসীদিগের ন্যায় রোমকদিগকেও উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্পার্টা ও রোমের সমাজ প্রথমে এক উপাদানেই সংগঠিত হয়। এক দিকেই উভয়ের গতি হয়। উভয়েই অসীম সাহস, অসামান্য উৎসাহ ও অতুল্য অধ্যবসায় সহকারে প্রতিবেশীদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া রণকণ্ডুর বিনোদন করে। ক্রমে জ্ঞানের ক্ষীণালোক ধীরে ধীরে রোমে প্রবিষ্ট হয়, ধীরে ধীরে আপনার তেজ সংগ্রহ করে এবং শেষে এথেন্সের অনুকূলতায় সম্প্রসারিত হইয়া, অপ্রতিহতবেগে সমগ্র রোম আলোকিত করিয়া তুলে। রোমকেরা প্রথম

---

* ইউরিপিদেস্ স্বপ্রণীত কাব্যে এই ভাবে স্পার্টার মহিলাদিগের বর্ণনা করিয়াছেন:—

"দেখাতে সাহস বীর্য্য যুবকের দলে,
আলয় ছাড়িয়া তারা মিলিত সকলে।
বায়ুবেগে তনুবাস উড়িয়া যাইত,
ক্রীড়াকালে চারু অঙ্গ উলঙ্গ হইত।"

এই বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্পার্টার মহিলাগণের মধ্যে লজ্জাশীলতার তাদৃশ গৌরব ছিল না।

আপনাদের প্রসিদ্ধ "দ্বাদশ ধারা" নামক* আইন ও যাজক সমাজ† হইতে ব্যবহারশাস্ত্র ও রীতিনীতি শিক্ষা করে। এই দ্বাদশ ধারা ও যাজকসমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজ রোমের শিক্ষাগুরু ছিল না। পরে খ্রিঃ পূঃ ১৫৫ অব্দে এথেন্স হইতে দুই জন রাজদূত রাজকার্য্যে উপলক্ষে রোমে উপনীত হয়েন। বিদ্যা ও নানা বিষয়ে ইঁহাদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। রোমের যুবকগণ এত দিন জ্ঞানের যে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রসারিত ক্ষেত্রে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিয়া, ইঁহাদের সমক্ষে উপনীত হইল, এবং অপূর্ব্ব আনন্দসহকারে ইঁহাদের নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল। এই দূতদ্বয়ের অন্যতরের নাম কারনিদেস্। কারদিনেস্ বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া, রোমে অদৃষ্টচর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার তেজস্বিনী বাগ্মিতা, রোমক যুবকদিগের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ সঞ্চারিত করিল। ইহা দেখিয়া, কেতোর হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার উদয়

গ্রোট সাহেব গ্রীসের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, স্পার্টাবাসিনীগণ পুরুষদিগের ন্যায় মল্লযুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা একরূপ আলগা "টিউনিক" (গাত্রাবরণবিশেষ) মাত্র পরিধান করিত। তজ্জন্য তাহাদের হস্ত পদাদি দেখা যাইত।

* খ্রিঃ পূঃ ৪৫৪ অব্দে আইন শিক্ষার জন্য তিন ব্যক্তি রোম হইতে গ্রীসদেশে প্রেরিত হয়েন। খ্রিঃ পূঃ ৪৫২ অব্দে তাঁহারা রোমে প্রত্যাগত হইলে দশ ব্যক্তিকে লইয়া একটি সভা করা হয়। এই সভার সদস্যগণ "দিসেম্বর" নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারাই আইনপ্রণয়নে নিয়োজিত হয়েন। ইঁহাদিগের বিধিবদ্ধ আইন "দ্বাদশ ধারা" নামে প্রসিদ্ধ। এই আইনপ্রণয়ন খ্রিঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে সম্পন্ন হয়।

† রোম নগরে যাজকদিগের একটি সমাজ ছিল। এই সমাজ সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

হইল। তিনি ভাবিলেন, কারনিদেস্ বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, রোমকদিগের হৃদয় যেরূপ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে রোমকদিগের সমরানুরাগ শীঘ্র মন্দীভূত হইবে। এই দূতের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, কেতোর হৃদয়ও সেইরূপ দিন দিন আতঙ্কের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দূতের প্রথম বক্তৃতা যখন লাতিন ভাষায় অনূদিত হইল, তখন কেতো আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে সেনেট্ সভায় উপস্থিত হইয়া, দূতকে রোম হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সিপিও প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান সদস্য এ বিষয়ে আপত্তি করাতে বিদ্যার সম্মান রক্ষা পাইল। শেষে কেতো স্বয়ংই বৃদ্ধাবস্থায় গ্রীক্ সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে নেবিয়স্ ও প্লতাস্ বহুবিধ নাটক রচনা করিয়া, উহার স্রোতে রোম প্লাবিত করিয়া তুলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইতালিতে সাহিত্যের চর্চ্চা হয়। পরে নেবিয়স্ যখন তীব্রশ্লেষপূর্ণ কবিতার প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গ্লানির প্রতিষেধক আইন করিবার প্রয়োজন হইল। নেবিয়স্ স্বপ্রণীত কবিতায় অভিজাতসম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির নিন্দা করাতে এক সময়ে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রোমের সম্রাট্ অগস্তসের সময়ে নিন্দাপূর্ণ গ্রন্থসমূহ দগ্ধ করা হইত। গ্রন্থকারেরা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেন। ফলতঃ এথেন্সের ন্যায় রোমেও দেবদ্বেষী ও নরনিন্দক গ্রন্থকারদিগকে বিলক্ষণ রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট অন্য কোন গ্রন্থের দোষগুণের বিচার করিতেন না।

সুতরাং এথেন্সের ন্যায় রোমেও দুর্নীতির পরিপোষক ও উৎসাহ-দায়ক গ্রন্থসমূহ বিনা বাধায় প্রণীত ও প্রচারিত হইত। রাজ-নীতিবিষয়ক গ্রন্থের প্রচার সম্বন্ধে রোমের সাধারণতন্ত্র কোন রূপে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লিবির ইতিহাস যদিও রোমের রাজসংসারের এক দলের বিরুদ্ধবাদী ছিল, তথাপি সেই দলের অধিনেতা অক্তবিয়স্ কাইসর উক্ত গ্রন্থের প্রচার রহিত করেন নাই। ইহার পর অগস্তস্ অক্তবিয়স কাইসর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ওবিদনামক এক জন কবিকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করেন। লোকে তখন মনে করিয়াছিল, ওবিদ একখানি অশ্লীল কাব্য প্রণয়ন করাতে তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ড হয়। কেহ কেহ এই নির্ব্বাসনের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে একটি কারণ এই, অগস্তসের কন্যার সহিত ওবিদের প্রণয় জন্মিয়াছিল, ইহাতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেন ওবিদ স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন যে, তিনি হঠাৎ কোন গোপনীয় বিষয় দেখিয়াছিলেন, এজন্য অগস্তস তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। যাহা হউক, কালক্রমে রোমে সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইলে একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হইল। এই সময়ে গ্রন্থকারেরা অনেক পরিমাণে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে লাগিলেন। ইহাতে অসদ্‌গ্রন্থের যত ভ্রমন হউক বা না হউক, সদ্‌গ্রন্থের বিলক্ষণ অনিষ্ট ও তন্মূলক রোমের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হইলেও সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থকার-দিগের প্রতি অনেক প্রকার অত্যাচার হয়। প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মান্ধতা অতিশয় বলবতী ছিল। তদানীন্তন খ্রিষ্টমতাবলম্বীদিগের হৃদয় কুসংস্কারে এমন আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, গ্রন্থের প্রচারবিষয়ে

বাধা দেওয়া যে, কেমন অনুদারতার কর্ম্ম, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। খ্রিষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী গ্রন্থসমূহ একটি নির্দ্দিষ্ট সভায় পরীক্ষিত ও দণ্ডার্হ হইত। যাবৎ এই সভা পুস্তক পরীক্ষা না করিতেন, তাবৎ কোন সম্রাট্ কোন পুস্তক দগ্ধ বা উহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল খ্রিষ্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের বিষয়েই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে ধর্ম্মান্ধতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, খ্রিঃ ৩৯৮ অব্দে কার্থেজে যখন সভা হয়, তখন ধর্ম্মযাজকগণকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থ পাঠ কবিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রি পল কহিয়া গিয়াছেন, খ্রিঃ অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণ ও মন্ত্রিসভা কোন্ কোন্ গ্রন্থ অসৎ, কেবল তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; তাহার পর সেই সকল গ্রন্থের অনুশীলন পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর পর রোমের পোপেরা যখন রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধের প্রতি তাঁহারা কোন প্রকার আপত্তি করিতেন, তৎসমুদয় হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইত। পোপ পঞ্চম মার্টিনের সময় পর্য্যন্ত এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকিয়া, উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া তুলে। পঞ্চম মার্টিন যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত করেন, তাহাতে জানা যায়, কেবল যে, খ্রিষ্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল এরূপ নয়; যে সকল ব্যক্তি সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে নিষ্কাশিত করা হইত। খ্রিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পোপের অনুমোদিত ধর্ম্মমতের বিরোধীদিগের বিচার জন্য স্পেনে যে বিচারসমিতি

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত অস্ত্রিয়ার অন্তঃপাতী ট্রেণ্ট নগরের গ্রন্থশাসনী সভার যে পর্য্যন্ত কোন সংশ্রব হয় নাই, সে পর্য্যন্ত পোপ দশম লিও এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চম মার্টিনের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। খ্রিঃ ১৫৪৫ অব্দে ট্রেণ্টের সভার অধিবেশন হয়। চতুর্থ পায়স্ এই সময়ে রোমে পোপের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সভায় পুস্তকাদি সম্বন্ধে দশটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। এই দশটি নিয়মই পোপ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ সমুদয় পুস্তকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুস্তক পরীক্ষকদিগের অনুমোদিত হইবে, তৎসমুদয় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে দেওয়া যাইবে। পরীক্ষকসমাজ যে সকল গ্রন্থের অনুমোদন না করিবেন, তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে দেওয়া হইবে না। প্রতিষিদ্ধ গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইত। এই তালিকা দুই অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশে সর্ব্বাংশে দূষিত গ্রন্থাবলীর নাম, এবং অপর অংশে সংশোধনোপযোগী গ্রন্থের নাম লিখিত হইত। নিষিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও প্রচারণ সম্বন্ধে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ট্রেণ্টের সভার একটি তালিকা ছিল। খ্রিঃ ১৫৫৯ অব্দে চতুর্থ পল্ আর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ৬১ জন মুদ্রাকর এই তালিকানির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ পুস্তকের মুদ্রণ অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েন, এবং তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রস্থ সমুদয় পুস্তকের প্রচার প্রতিষিদ্ধ হয়। পঞ্চম পায়সের সময়েও এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকে। পঞ্চম পায়স্ নিষ্ঠুরস্বভাব ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং তিনি পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে তীব্রতর নিয়মব্যবস্থাপনে

কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ব্যবস্থার তীব্রতা ও কঠোরতা কিয়দংশে তিরোহিত হয়।

এইরূপে রোমের পোপগণ সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁহাদের অপরিসীম ক্ষমতা, অবিচলিত দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মান্ধতা তাঁহাদের হৃদয়কে কঠোরতর করিয়া তুলে, বিচারশক্তিকে কলুষিত করিয়া দেয়, বিবেক বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এবং উদারতাকে দুরপনেয় কলঙ্কসাগরে ডুবাইয়া রাখে। তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের অদ্বিতীয় বিধাতা হইয়াও অধর্ম্মভাবের পরিচয় দেন, এবং সারস্বতী শক্তির অপ্রতিহত প্রতিপোষক হইয়াও, উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনায় উদ্যত হয়েন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পোপ দ্বিতীয় অনরিয়স, নবম গ্রেগরি ও চতুর্থ ইনোসেণ্ট প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধবাদী গ্রন্থসমূহের বিচারার্থে যে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ট্রেণ্টের সভাকর্ত্তৃক যে নিয়মাবলী প্রণীত হয়, তৎসমুদয় পোপের শাসনাধীন সমস্ত রাজ্যে ভাষার উন্নতির মূলে আঘাত করে। পোপগণ প্রতিষিদ্ধ পুস্তকসমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিতে থাকে। তালিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শব্দার্থের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের শব্দার্থের সাদৃশ্য না থাকাতে ভিন্ন দেশের তালিকাগুলিও পরস্পর বিপরীত মতের পরিপোষক হইয়া উঠে। এইরূপে পরীক্ষকসমাজের অব্যবস্থিততায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদি গ্রন্থের নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। রোমের এই কঠোর শাসনের মধ্যেও দুই একটি প্রদেশে পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ইহার উদাহরণস্থলে বেনিসের নাম নির্দ্দেশ

করা যাইতে পারে। বেনিসে সকলেই অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে পারিত। রোমের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এই স্বাধীনতার বিলোপে সমর্থ হয় নাই।

ইংলণ্ডেও পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন এথেন্স্ ও রোমের ন্যায় ইংলণ্ডও গ্রন্থসংহারবিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। অষ্টম হেন্‌রির রাজত্বসময়ে সকল প্রকার গ্রন্থই অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইত। এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বকালে কাথলিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ, মেরির শাসনসময়ে প্রোটেষ্টাণ্টসম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী, এলিজাবেথের আধিপত্যসময়ে রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ, এবং প্রথম জেম্‌স ও তাঁহার পুত্রদিগের প্রভুত্বকালে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থ এইরূপে করাল অনলশিখায় আত্মবিসর্জ্জন করিত। এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহার সময়ে গ্রন্থকারও গ্রন্থপ্রকাশকের প্রতিও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি এক জন গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রকাশকের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন! কারণ, গ্রন্থকার ঐ হাত দিয়া, গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন! অন্য এক জন গ্রন্থকর্ত্তার প্রাণদণ্ড হয়।

প্রথম চার্লসের সময়ে ইংলণ্ডে পুস্তকমুদ্রণের অনুমোদনবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিধি অনুসারে পরীক্ষকগণ যে সকল পুস্তক দূষণীয় বিবেচনা করিতেন, তৎসমুদয় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না। এই সময়ে ইংলণ্ডে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। ঘাতকের কঠোর কুঠারাঘাতে প্রথম চার্লস দেহত্যাগ করেন। ষ্টুয়ার্টবংশীয়ের রাজত্বের স্থলে সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। সাধারণতন্ত্রের

আধিপত্যকালে পুস্তকাদির প্রচার ও মুদ্রণকার্য্যে লোকের স্বাধীনতা হইল। কবিকেশরী মিল্টন এই স্বাধীনতার পরিপোষক হইলেন। তাঁহার উত্তেজনা, তাঁহার যুক্তিপ্রণালী, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার লিপিচাতুরী, ইংলণ্ডীয়দিগের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ইহাতে তদানীন্তন পুস্তকপরীক্ষক মাবটের হৃদয়ে এমন উদার ভাব সঞ্চারিত হইল যে, মাবট্ স্বকার্য্যপরিত্যাগার্থী হইয়া, সাধারণতন্ত্রের অধিনায়ক ক্রমওয়েলের নিকটে আবেদন করিলেন। এই জন্যে কিছু কাল পুস্তকাদির পরীক্ষা সম্বন্ধে কঠোরতা কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্হিত হয়। কালক্রমে সাধারণতন্ত্রের বিলোপ হইল। ষ্টুয়ার্টবংশীয়গণ আবার ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের রাজপদে সমাসীন হইলে গ্রন্থপরীক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয়। এই নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সক্রান্ত পুস্তকের পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ২০ জনকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। ইহারা যথানিয়মে জামিন দিয়া মুদ্রণকার্য্য সম্পাদন করিতেন। লণ্ডন, ইয়র্ক, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোন স্থানে পুস্তকমুদ্রণের অধিকার দেওয়া হয় নাই। অননুমোদিত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে মুদ্রাকর প্রভৃতির উপর কঠোর দণ্ড প্রয়োজিত হইত। মুদ্রণসংক্রান্ত এই আইন তিন বৎসর কাল প্রবল থাকে। ইহার পর আবার দুই বার এই আইন অনুসারে কার্য্য হয়। আইন প্রচলিত হইলে স্যার রজর এষ্ট্রেঞ্জ নামক এক জন বিখ্যাত পুস্তকলেখক পুস্তকপরীক্ষকের পদে নিয়োজিত হয়েন। ইহার সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইনি মিল্টনের সুপ্রসিদ্ধ

স্বর্গভ্রষ্ট কাব্যের দুই এক পংক্তিরও দোষোল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই পরীক্ষাপ্রণালী তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তৃতীয় উইলিয়মের শাসনকালে, খ্রিঃ ১৬৯৫ অব্দের ৩রা মে ইংলণ্ডের উদার শাসনপ্রণালীর গুণে ও উদার মতের পরিপোষক সম্প্রদায়ের চেষ্টায়,উক্ত বিধি বিলুপ্ত হয় এবং মুদ্রণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। মুদ্রণস্বাধীনতা ইংলণ্ডের উদার রাজনীতির একটি প্রধান ফল। এই স্বাধীনতার গুণে সকল প্রকার পুস্তক, সকল প্রকার সংবাদপত্র ও সকল প্রকার সাময়িক পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া, ভাষাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এই স্বাধীনতা না থাকিলে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র এত অল্প সময়ে এত উন্নত হইয়া, সমাজের বাগ্‌যন্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারিত না।

চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এক খানি সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা রোমনগর নির্ম্মাণের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্র খানিকে পৃথিবীর সমগ্র সংবাদপত্রের আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। খ্রিষ্টের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে রোমে "একতাদায়রণা" নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই সংবাদপত্রে রোমের সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইত*। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে খ্রিষ্টা-

* এই সংবাদপত্রস্থিত সংবাদের একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে। রোম নির্ম্মাণের ৫৮৫ বৎসর পরে "একতাদায়রণায়" এই সংবাদ লিখিত হয়—"সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোলতাইন পর্ব্বতের এক অংশে বজ্রপাত হওয়াতে একটি ওক বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে। ব্যাঙ্গার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ সীমায় যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে এক জন বিশ্রাম-

ম্বের পূর্ব্বসাময়িক সংবাদপত্রের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। খ্রিষ্টের জন্মগ্রহণের পরে ইতালিতে যে সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার নাম "নোতিজি স্ক্রিতি"; ইহা প্রতিমাসে বেনিস্ নগর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার পর বেনিসে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে "গেজেট" *নামে আর এক খানি সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে গেজেট বহুলপ্রচার হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহার মুদ্রণকার্য্য স্থগিত রাখেন। সুতরাং "গেজেট" "নোতিজি স্ক্রিতির" ন্যায় হস্তলিখিত হইয়া, প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সকল সংবাদপত্রের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। ইংলণ্ডে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার আধিপত্যসময়ে "লণ্ডন গেজেট", "অবজারবেটর" প্রভৃতি নামে যে সমস্ত সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ও বেনিসীয় গেজেটের অনুরূপ ছিল। ফলতঃ মুদ্রণস্বাধীনতার অভাবে কোন সাময়িক পত্রই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। শেষে পরিবর্ত্তনশীল সময়ের গুণে মানবসমাজ যখন উদারতাসম্পন্ন হইয়া, মুদ্রণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন সংবাদপত্রের উন্নতি ও তন্নিবন্ধন সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হইল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতে মুদ্রণস্বাধীনতার ইতি-

গৃহ-রক্ষক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছে। মাংস-বিক্রেতারা ওবারসিয়রের অপরীক্ষিত মাংস বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া, মাজিষ্ট্রেট্ তার্দ্দিনিয়স তাহাদের জরিমানা করিয়াছেন। এই জরিমানার টাকা তেলাস দেবীর মন্দির-সংলগ্ন উপাসনা-গৃহনির্ম্মাণে প্রদত্ত হইয়াছে।"

* একরূপ মুদ্রার নাম "গেজেটা"। একটি গেজেটা দিলেই লোকে সংবাদপত্র পড়িতে পাইত। এজন্য গেজেটা মুদ্রার নামানুসারে সংবাদপত্রের নাম "গেজেট" হয়।

হ্রাসেও প্রথমে অনেক স্বেচ্ছাচারিতা পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কি ইংরেজী, কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, "হিকির বেঙ্গল গেজেট" নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র। ১৭৮০ অব্দে উহা প্রচারিত হয়। হিকি সাহেবের গেজেটে সংবাদপত্রের উপযুক্ত ধীরতা বা গাম্ভীর্য্য ছিল না। সম্পাদক অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতেন। যাহা হউক, হেষ্টিংসের পর লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্ ও স্যার জন শোরের আধিপত্যসময়ে সংবাদপত্র ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময়ে সংবাদপত্র ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা অনেকাংশে পরিত্যাগ করে, এবং যে যে বিষয়ের সহিত সাধারণের সংশ্রব আছে, তৎসমুদয়েরই আন্দোলন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা ধীর ও গম্ভীর ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু এ সময়েও সংবাদপত্রের উপর গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। সম্পাদকদিগকে অনেক সময়ে রাজদ্বারে অপদস্থ হইতে হইত। ইহারি উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। ১৭৯৪ অব্দে ডুয়ানে নামক এক জন আমেরিকাপ্রবাসী আইরিষ কলিকাতায় "ইণ্ডিয়ান্ ওয়ার্ল্ড্" নামে এক খানি সংবাদপত্র বাহির করেন। ১৭৯৫ অব্দের ১লা জানুয়ারি, ডুয়ানে আপনার সংবাদপত্র বিক্রয় করিবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ডে" যদিও গবর্ণমেণ্ট তীব্রভাবে তিরস্কৃত হয়েন নাই, সম্পাদক

যদিও গবর্ণমেণ্টের সম্মান রক্ষা করিয়াই, প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিতেন, তথাপি ডুয়ানে কর্ত্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। এই সময়ে স্যার জন শোর (পরে লর্ড টেন্‌মাউথ) ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৯৪ অব্দের ২৭শে ডিসেম্বর গবর্ণরজেনেরলের প্রাইবেট্ সেক্রেটরি কাপ্তেন কলিন্স্, ডুয়ানেকে গবর্ণমেণ্ট্ হাউসে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ডুয়ানে নিজের কোন অপরাধ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ আশঙ্কার আবির্ভাব হইল না। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয়, গবর্ণরজেনেরল তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডুয়ানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রফুল্ল-চিত্তে গবর্ণরজেনেরলের বাটীতে উপনীত হইলেন। কাপ্তেন কলিন্স্ তাঁহাকে একটি ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন,

"আপনি যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতরূপে সমুদয় কাজ করেন, তহোতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ডুয়ানে পুর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন,

"আমি সকল কাজই যথাসময়ে করিয়া থাকি। ভরসা করি, গবর্ণরজেনেরল মহোদয় ভাল আছেন।"

এই কথায় কাপ্তেন কলিন্স্ বলিলেন,

"তাঁহার দেখা পাইবেন না এবং——"

ডুয়ানে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন, কাপ্তেনের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহাকে কহিলেন,

"আমি বুঝিয়াছিলাম, তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

কাপ্তেন কলিন্স্ গম্ভীরভাবে কহিলেন,

"হাঁ। কিন্তু আমি গবর্ণরজেনেরলের আদেশে আপনাকে

জানাইতেছি যে, আপনি এখন কয়েদীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন।"

সম্মুখে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে পথিক যেরূপ স্তম্ভিত হয়, কাপ্তেন কলিন্সের কথায় ডুয়ানে সেইরূপ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার ললাটদেশ আকুঞ্চিত ও নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। অসময়ে, অতর্কিতভাবে এইরূপ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া, তিনি মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র কতিপয় সঙ্গীনধারী সৈনিক আসিয়া ডুয়ানেকে বেষ্টন করিল। ডুয়ানে মুক্তদ্বারপথে দেখিলেন, গবর্ণরজেনেরল স্যার জন শোর ব্যবস্থাপকসমাজের দুই জন সদস্যের সহিত এক খানি সোফায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ডুয়ানে কাপুরুষ ছিলেন না, সাহসের সহিত কহিলেনঃ—

(স্যার জন শোর এবং কাপ্তেন কলিন্সের দিকে মুখ ফিরাইয়া) "আপনি যে, এরূপ নীচপ্রকৃতি ও এরূপ বিশ্বাসঘাতক হইবেন, আমি কখনও তাহা ভাবি নাই।"

"চুপ।" গম্ভীরশব্দে কাপ্তেন কলিন্সের মুখ হইতে এই কথাটি বাহির হইল। পরে কাপ্তেন সৈনিকদিগকে কহিলেন, "ইহাকে লইয়া যাও।"

"বন্ধুগণ! আমি ধীরে ধীরে তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।" ডুয়ানে সৈনিকদিগকে ইহা কহিয়া, কাপ্তেন কলিন্সকে ঘৃণা ও বিদ্রূপের সহিত বলিলেন,

"কলিন্স্! ইহার পর আর কিসের আবির্ভাব হইবে? ধনুক না তরবারি?"

কাপ্তেন কলিন্স্। "আপনি বড় দুর্ম্মুখ। (সৈনিকদিগের প্রতি) শীঘ্র ইহাকে লইয়া যাও।"

ডুয়ানে পরিশেষে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে কহিলেন,

"আপনি তুরুস্কের প্রধান উজীরের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিলেন। গবর্ণরজেনেরল তুরুস্কের সুলতান হইলেন; এবং কলিকাতা তাঁহার কনস্তান্তিনোপল হইল।"

অস্ত্রধারী সৈন্যকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, ডুয়ানে তিন দিন ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গে থাকেন। পরে তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। এই খানে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষে তাঁহার প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। উহার এক পয়সাও তাঁহার হাতে আইসে নাই। ডুয়ানে অতঃপর ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে যাইয়া "অরোরা" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েন। এই সংবাদপত্র সর্ব্বদা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত।

পরবর্ত্তী গবর্ণরজেনেরল লর্ড করণ্‌ওয়ালিসের উপর সংবাদ-পত্রের কোনরূপ আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত, তাহা করণ্‌-ওয়ালিসের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই লেখা হইত। অধিকন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের রীতিমত সমালোচনা থাকিত না। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন বিষয়ে কোনরূপ কঠোরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলেও ইহা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না। সুতরাং তখন সাধারণকে যে যে সংবাদ দেওয়া হইত, অথবা সাধারণের সমক্ষে যে যে বিষয় লইয়া আন্দোলন হইত, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ততটা অসুবিধা বা বিরক্তি হইত না। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইয়া আইসেন, তখন ইংরেজ-দিগের সহিত, ফরাসীদিগের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। এই সময়ে ফরাসীগণ ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের ক্ষমতা লোপ করিয়া,

আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে উৎসুক ছিল। এই সঙ্কটকালে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ সাবধানে ও ধীরভাবে কার্য্য করিতে হইত। এই সময়ে সংবাদপত্র যদি যুদ্ধের কোন সংবাদ প্রকাশ করে, অথবা না বুঝিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা রটাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেস্‌লি সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই নিয়মানুসারে সংবাদপত্রের এক জন পরীক্ষক নিযোজিত হয়েন, এবং সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জন্য কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইংরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারীদিগকে* ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য তাঁহাদের যে সমস্ত অনুমতিপত্র† থাকিত, তৎসমুদয় রদ করা হইত। সুতরাং যে সকল সম্পাদক বা সংবাদপত্রের অধিকারী সংবাদপত্রে লেখার দোষে ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইতেন, তাঁহারা বিলাতে উপস্থিত হইয়াই, তুমুল গণ্ডগোল বাধাইতেন; ভারতবর্ষে ইংরজেদিগের এ বিষয়ে যথেচ্ছাচার ও দৌরাত্ম্যের উল্লেখ পূর্ব্বক আন্দোলন করিতেন, এবং যাহাতে মুদ্রণস্বাধীনতা স্থাপিত হয়, যাহাতে সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্যে স্থানে স্থানে

* এ সময়ে এতদ্দেশীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না। সুতরাং কেবল ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন্যই এই বিধি প্রস্তুত হয়।

† পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যসময়ে শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন, অপর যে সমস্ত ইংরেজ বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত, তাহাদিগকে এ দেশে বাস করিবার জন্য এক একখানি অনুমতিপত্র দেওয়া হইত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ঐ অনুমতিপত্র রদ করিতে পারিতেন।

তীব্র বক্তৃতা করিয়া, স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশীয়দিগকে ঐবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী করিতে চেষ্টা করিতেন।

লর্ড মিণ্টোর আধিপত্যকালেও (১৮০৭-১৮১৩ খ্রিঃ অব্দ) সংবাদপত্রসমূহ এইরূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্র হইতে নানারূপ আশঙ্কা করিতেন। সুতরাং তখন সংবাদপত্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একমাত্র নীতি ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহ দিতেন না*। সংবাদপত্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই, মিণ্টোর গবর্ণমেণ্ট সংবাদ-পত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই; সুতরাং

* এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাপ্তেন সিডেন-হাম এই সময়ে হয়দরাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিষয়ে নিজামের কৌতূহলতৃপ্তির জন্য একটি বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র, একটি মুদ্রাযন্ত্র এবং একখানি যুদ্ধজাহাজের নমুনা আনয়ন করেন। সিডেনহাম এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরিকে জানাইলে সেক্রেটরি মুদ্রাযন্ত্রের স্থায় ভয়ানক বিপত্তিজনক অস্ত্র এক জন ভারতবর্ষীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, রেসিডেণ্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। রেসিডেণ্ট তিরস্কৃত হইয়া লিখিয়া পাঠান, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতি নিজাম কিছুই মনোযোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশৃঙ্খলভাবে তোষাখানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সভ্যতার এই ভয়ানক অস্ত্র সুব্যবস্থিত হইয়া কোনও অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারিবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ভীত হয়েন, তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।

ওয়েলেস্‌লি যে পরীক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাকে। সংবাদপত্রের প্রুফ্ (কোন বিষয় ছাপাইবার পূর্ব্বে সেই বিষয় যে কাগজে মুদ্রিত করিয়া ভুল সংশোধন করা হয়) দেখিবার ভার, গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরির হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রণালীতে সংবাদপত্রসমূহ লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল এবং লর্ড হেষ্টিংসের শাসনসময়ের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত, নিতান্ত দুরবস্থায় থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত গবর্ণরজেনেরল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা অধিকতর উদারপ্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব বা কিছু মাত্র সন্দেহ না করিয়া, সাধারণকে জানাইলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সমালোচিত হওয়া উচিত। শাসনকর্ত্তা যতই সদভিপ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্য্য করিবেন, ততই তিনি সাধারণকে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার দিতে সম্মত হইবেন।

গবর্ণরজেনেরলের এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে বিঘ্ন ছিল, তাহা ক্রমে অল্পতর হইয়া আইসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতাজর্ণাল" নামে আর এক খানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সবিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে। "কলিকাতাজর্ণালে" গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সর্ব্বপ্রথম সতেজে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হইয়া উঠেন। ১৮১৮ অব্দে মিশনরিদিগের যত্নে শ্রীরামপুর হইতে "সমাচারদর্পণ" নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রচারিত হয়। এ স্থলে যে উদারপ্রকৃতি গবর্ণরজেনেরলের

নাম উল্লিখিত হইল, তিনিই এই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উৎসাহদাতা। লর্ড হেষ্টিংস যেমন সাধারণকে সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ক্ষমতা দিয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদপত্রকেও যথোচিত উৎসাহ দিয়া, আপনাদের মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই, হেষ্টিংসের মন্ত্রিগণের সকলেই প্রাচীন দলের লোক ছিলেন। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহাদের অনেকের সমবেদনা ছিল না। তাঁহারা সংবাদপত্রসমূহ পূর্ব্ববৎ কঠোরনিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই ভালবাসিতেন। জন আডাম এই দলের প্রধান ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতেও অবিচলিত থাকেন। আডামের পরামর্শে তিনি স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের পথ কণ্টকিত করেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদপত্রের স্কন্ধে কোনরূপ গুরুতর ভার চাপাইয়া রাখেন নাই।

কিন্তু হেষ্টিংসের কার্য্যকাল শেষ হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। এই অবসরে জন আডাম আবার জাগিয়া উঠিলেন। আডাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এক জন পরিশ্রমী ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু পুরাতন রাজনীতির প্রতি তাঁহার আস্থা ও মমতা ছিল। এই জন্যে তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সর্ব্বাংশে রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গবর্ণমেণ্টের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহের দমন শ্রেয়ঃকল্প। লর্ড হেষ্টিংস্ প্রস্থান করিলে ১৮২৩ অব্দে জন আডাম কিছু কালের জন্য, ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইলেন। সুতরাং নিজের বিশ্বাস

অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার সমক্ষে কোন রূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আবার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উত্তোলিত হইল। আডাম এত কাল বৃথা যাহার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্য গবর্ণরজেনেরলকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্য নানা রূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, এখন স্বয়ং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ উত্তোলিত অস্ত্র লক্ষ্যে পতিত হইল। কলিকাতাজর্ণালের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেব ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য চিরকালের মত নষ্ট হইয়া গেল। তিনি কয়েক বৎসর কাল, ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। ইংরেজ গবর্ণমণ্টের এইরূপ যথেচ্ছাচারেও ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ একবারে নীরব হইল না। লোকে যখন জানিতে পারিল যে, গবর্ণরজেনেরল সহজে এক জন ইংরেজ সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সম্পাদকদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারেন না, যেহেতু ভারতবর্ষীয়দিগের আদি বাসস্থানই ভারতবর্ষ, সুতরাং গবর্ণরজেনেরলের নিয়ম তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হয়, তখন ডিসোজা অথবা ডিরোজেরিওর ন্যায় কোন ফিরিঙ্গিশ্রেষ্ঠের নামে বিরক্তিকর সংবদপত্র চলিতে লাগিল। কিন্তু আডাম সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ* ও ৫ই এপ্রেল এই সকল নিয়ম

* ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ জন আডাম কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের শাসনসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণীত হয়। ১৮৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ গবর্ণরজেনেরল লর্ড লীটন

বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে সংবাদপত্রসমূহ পদার্থশূন্য হইল এবং উহাদের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লর্ড আমহর্ষ্ট বোধ হয়, আডামের এই কঠোর বিধির পরিপোষক ছিলেন না, এবং এই অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিও বোধ হয়, তাঁহার ততটা অনুরাগ বা আস্থা ছিল না। কিন্তু আডামের আইন অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যেক শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারীর অনুমোদিত হইয়াছিল, সুতরাং আমহর্ষ্ট প্রথমে এ দেশে আসিয়া বাধ্য হইয়া, ঐ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সংবাদপত্রের প্রতি যে অত্যাচারের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা কিছু কাল অটলভাবে থাকিল। পরে আমহর্ষ্ট যখন সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এই অত্যাচারের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সম্বন্ধে যে বাধা ছিল, তাহা আবার ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আমহর্ষ্টের রাজ্যশাসনের শেষ দুই বৎসর কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না; মুদ্রণসম্বন্ধে সমস্ত অত্যাচার তিরোহিত হইল,

এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রাদির স্বাধীনতা হরণ করেন। প্রথম ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা ইংরেজী বাঙ্গালা প্রভৃতি ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার সংবাদপত্রের জন্য নিরূপিত হয়; শেষ ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রাদির জন্য বিধিবদ্ধ হইয়া উঠে। প্রথম ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা অপেক্ষা শেষ ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা অধিকতর কঠোর ও অধিকতর অবনতিকর। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থার সহিত ১৮৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থার এইরূপ প্রভেদ। জন আডাম যাহা করিতে পারেন নাই, লর্ড লীটন অবলীলাক্রমে তাহা করিয়াছেন।

এবং সংবাদপত্রসমূহ শান্তভাবে ও নীরবে আপনাদের কার্য্য সাধন করিতে লাগিল।

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইয়া আসিলেন। উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করিত। তিনি এখানে আসিয়াই সমুদয় সংবাদপত্রকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। বেণ্টিঙ্ক্ সংবাদপত্র হইতে কোন রূপ আশঙ্কা করিতেন না, বরং উহাকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকারী সুহৃদ্ বলিয়াই মনে করিতেন; তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, "ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর থাকিয়া, আমি সংবাদপত্র হইতে যত বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এত আর কিছুতেই নহে।" অথচ কেহই লর্ড বেণ্টিঙ্কের ন্যায় সংবাদপত্রে অধিকতর তিরস্কৃত বা অধিকতর নিন্দিত হয়েন নাই।

এক সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক্‌কে শ্রেণীবিশেষের অসন্তোষজনক একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। বিলাতের ডিরেক্টর সভা, সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বাটা কমাইবার প্রস্তাব করেন। বেণ্টিঙ্ক্ এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে চারি দিকে মহাগোলযোগের আরম্ভ হয়। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, নানা প্রকার কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ ও পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক্ ইহাতে দৃক্‌পাত করেন নাই, কিংবা বিরক্ত হইয়া, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কোন রূপ বিঘ্ন জন্মান নাই। ক্রমে এই বাটার বিষয়ে সাধারণের যে বিরাগ ছিল, তাহা কটুতর প্রবন্ধাদি লিখিতে লিখিতেই শেষ হইয়া যায়। সংবাদপত্র অসন্তোষনিবারণের একটি প্রধান উপায়। কোন বিষয়ে অসন্তোষ জন্মিলে, সাধারণে সংবাদপত্রে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিয়া, সেই

অসন্তোষের অনেক লাঘব করিয়া থাকে। সুতরাং হৃদয় যে অসন্তোষে পূর্ণ থাকে, কালীর সহিতই ক্রমে তাহা বাহির হইয়া, হৃদয়কে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া তুলে। এই অসন্তোষ আর সবেগে প্রকাশ পাইয়া, কোন রূপ গোলযোগের কারণ হয় না। এই জন্যে সংবাদপত্রের স্তম্ভে অসন্তোষকর লেখা দেখিলেই, একবারে সমগ্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করা অবিবেচনার কর্ম্ম। বেণ্টিঙ্ক্ নীরবে ও ধীরভাবে সংবাদপত্রের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, নীরবে ও ধীরভাবে উহার মতামত শুনিতে লাগিলেন, এবং নীরবে ও ধীরভাবে আপনার কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি আডামের ন্যায় কোনরূপ কঠোর বিধি অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ব্যাঘাত জন্মাইলেন না। ইহার পর ১৮৩০ অব্দে যখন বিলাতের ডিরেক্টরসভার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আসিয়া পঁহুছিল; সভা যখন অর্দ্ধ বাটার বিরুদ্ধে সমস্ত আপিল রহিত করিয়া, আপনাদের রায় বহাল রাখিলেন; সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত যখন সেই সমস্ত কাগজপত্র প্রকাশ করিবার সময় হইল, তখন বেণ্টিঙ্ক্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ঐ সকল কাগজ প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রসমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিবে, এবং ডিরেক্টরদিগের সভাকে সাধারণের নিকটে অপদস্থ করিয়া তুলিবে; এজন্যে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা উচিত কি না, বেণ্টিঙ্ক্ তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত স্থির হইল। বেণ্টিঙ্ক্ আডামের ন্যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়ে স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক-

সভার সদস্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মেটকাফ্ তাঁহার এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি যদি রাজ্যের অধিপতি, প্রভু বা কর্ত্তা হই, তাহা হইলে সংবাদপত্রসমুদয়কে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিব।" এক্ষণে সেই পাঁচ বৎসরের সিদ্ধান্ত মেটকাফের হৃদয় হইত দূরীভূত হইল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে জানিয়া, মেটকাফ্ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বেণ্টিঙ্কের মতের বিরুদ্ধে, নিম্নলিখিত ভাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন :—

"সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ডিরেক্টরসভায় অর্দ্ধ বাটার বিষয়ে যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ে উক্ত সভার সমুদয় কাগজপত্র প্রকাশ করিবার সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি সাতিশয় দুঃখিত হইলাম।

"আমার বিবেচনায় ইহাতে সাধারণের মনে একটি নূতন বিরাগ উপস্থিত হইবে। এরূপ বিরাগ উপস্থিত করা নিতান্ত অনাবশ্যক।

"অনেক দিন হইতে সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় বিষয়েরই সমালোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ডিরেক্টরদিগের পূর্ব্ব আদেশ ও বর্ত্তমান আদেশে এমন কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না যে, প্রথমটিতে আন্দোলন করিবার যেমন অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অপরটিতে সেইরূপ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

"আমর মতে অর্দ্ধ বাটা সম্বন্ধে যে আন্দোলন করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। ইহাতে একটি

অসন্তোষকর কার্য্যের উপর সাধারণের মত প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যাহারা এতদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা মনে মনে ইহাই বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অসন্তোষের কারণ সকলেই জানিতে পারিয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ের পুনর্ব্বিচার করিতে বিমুখ হইবেন না।

"আমার বিবেচনায় অন্য একটি নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করা অপেক্ষা যাহার যে মত, তাহা প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত।

"উপস্থিত বিষয়ে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, আমার মতে তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর ক্ষতিকারিক কিছুই প্রকাশিত হইতে পারে না। সৈনিকদিগের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে তাহার হ্রাস হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়াছে, তাহাদের যুক্তি ক্ষয় পাইয়াছে, তাহাদের মূল বিষয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ডিরেক্টরগণ যে, এরূপ আদেশ দিবেন, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানিত। এক্ষণে ঐ আদেশপত্র প্রচার করিলে সংবাদপত্রে যে সকল পত্র বাহির হইবে, তাহাতে যে, কোনরূপ ক্ষতি হইবে, এমন বোধ হয় না। কিন্তু এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে না দিলে আর একটি নূতন অসন্তোষ উপস্থিত হইবে, এবং একটি নূতন অভিযোগ বর্ত্তমান থাকিবে।

* * * * *

"অপকার অপেক্ষা উপকারের পরিমাণ অধিক দেখিয়া, আমি সর্ব্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি।

"আমি স্বীকার করি, প্রজালোকের অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতার

ন্যায় মুদ্রণস্বাধীনতাতেও সময়বিশেষে হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু উপস্থিত সময়ে হস্তক্ষেপ করা আমার মতে উচিত বোধ হয় না। যখন দুই দিকেই গবর্ণমেণ্টের বিপদের সম্ভাবনা, তখন স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াতেই অধিকতর বিপদ ঘটিতে পারে; যেহেতু, স্বাধীনতার স্রোত প্রবাহিত থাকিলে দূষিত পদার্থগুলি সহজেই নির্গত হইয়া যায়। সাধারণের চিন্তা ও সমবেদনার গতি রোধ করা অসম্ভব। আমার বিবেচনায় সাধারণের অসন্তোষ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত, না দিলে ঐ অসন্তোষ একরূপ স্থায়ী হইয়া উঠে, এবং সময়বিশেষে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

"মুদ্রণস্বাধীনতায় যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন, মুদ্রাযন্ত্র হইতে যাহা বাহির হয়, তাহার জন্য সেই গবর্ণমেণ্টই দায়ী থাকেন। কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে রাজপুরুষদিগের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কেহ এই বিষয়ে অভিযোগ করাতে তাঁহাদিগকে আমরা এই ভাবে উত্তর দিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষের কোন বিদেশীয় অধিকারের শাসনকর্ত্তাকে পত্র লিখিবার সময়েও বোধ হয়, আমরা এই ভাব প্রকাশ করিয়াছি? এক্ষণে আমরা কি প্রকারে, এক সময়ে এইরূপ বলিয়া, অন্য সময়ে মুদ্রণস্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মাইব?"

এই লিপির ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব সরল এবং যুক্তি সুশৃঙ্খল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার লেখনী হইতে যেরূপ সরলভাবে যে সরল ভাষা নির্গত হইয়াছিল, পাঁচ বৎসর পরেও তাঁহার লেখনী হইতে সেইরূপ সরলভাবে সেই সরল ভাষা নির্গত

হইল—"আমি সর্ব্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি।"

মেটকাফ্ সবিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার এই উদার মত রক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন। ১৮৩২ অব্দের বসন্ত কালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভার প্রতিনিধি সভাপতি হয়েন। এই সময়ে কলিকাতার একখানি সংবাদপত্র বোম্বাইর গবর্ণরের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। গবর্ণর এজন্য সেই কাগজের সম্পাদককে বলপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে, নচেৎ তাঁহার সম্পাদিত পত্রের স্বাধীনতা লোপ করিতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকটে এক খানি পত্র লিখেন। স্যার চার্লস মেটকাফ্ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ থাকাতে ঐ পত্রের এক খানি প্রতিলিপি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। সুতরাং বোম্বাই গবর্ণরের প্রার্থনাপূরণের ভার মেট্‌কাফের উপরেই পড়ে। কিন্তু মেটকাফ্ এত দিন যে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, সে মত পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হৃদয় কোনরূপ কাতরোক্তিতে, কোনরূপ বিনয়বাক্যে অবনত হইয়া পড়িল না, বোম্বাই গবর্ণরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মেট্‌কাফ্ অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে রহিলেন।

ইহার পরেও দুই বৎসর-কাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ সময়েও সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে। কোন রূপ নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, এই স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় নাই। মন্ত্রিসভা আডামের প্রবর্ত্তিত আইন রদ করিবার জন্য তখন কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা

বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, এই সময়ে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার কঠোরতা দূর করিতে উৎসুক হয়েন, এবং ১৮৩৪-৩৫ অব্দের শীতকালে যখন স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ এলাহাবাদে যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা, জন অডাম মুদ্রণসম্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবার জন্য গবর্ণরজেনেরলের নিকটে এক খানি আবেদনপত্র সমর্পণ করেন। ১৮৩৫ অব্দের ২৭শে জানুয়ারি এই আবেদনপত্র গবর্ণরজেনেরলের নিকটে পহুঁছে। গবর্ণরজেনেরল আবেদনকারীদিগকে এই উত্তর দেন যে, মন্ত্রিসভা মুদ্রণসম্বন্ধে পূর্ব্বতন অসন্তোষকর আইনের বিষয় বিচার করিয়া দেখিতেছেন। গবর্ণরজেনেরলের বিশ্বাস যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে সকলেই ধীরভাবে সাধারণ বিষয়ে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ইহা সকল প্রকার অন্যায় দোষারোপ ও বিদ্রোহসূচক ভাব হইতে গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিবে। কিন্তু এই "অল্প সময়ের মধ্যে"ই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ তাঁহার স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হয়েন।

মেট্‌কাফ্ এক্ষণে "অধিপতি, প্রভু ও কর্ত্তা" হইলেন। সুতরাং এত কাল তিনি যে সুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মেট্‌কাফ্ কালবিলম্ব করিলেন না। লেখকচূড়ামণি মেকলে এই সময়ে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তিনিও মেট্‌কাফের মতের অনুমোদন করিলেন। সুসময় নিকটবর্ত্তী হইল। অধিপতি, প্রভু ও কর্ত্তা প্রস্তুত হইলেন।

এপ্রেল মাসে মুদ্রণসম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩ অব্দে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল। এই আইনের স্থূল মর্ম্ম এই ঃ—"ব্রিটিশ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে, তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে, যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে, সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের নাম, ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে, তাহাকে যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট রাজপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সেই মুদ্রাযন্ত্রের বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা এই আইনের কোন ধারার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, তাহাদের জরিমানা বা কারাবাসদণ্ড হইবে। সংবাদ-পত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নামধাম প্রকাশ করা ব্যতীত নূতন আইন মুদ্রণস্বাধীনতায় কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না।

প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওয়াতে এই একটি মহৎ ফল হইল যে, যিনি যাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহারই রহিল; অর্থাৎ এক জনে মুদ্রণসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের দায়ী না হইয়া, সকলেই আপন আপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহিলেন; সুতরাং সকলেই আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া, পুস্তক ও সংবাদ-পত্রাদিতে স্বাধীনভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

এই আইন সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সন্তোষ জন্মাইল, সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই আইনে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া মেট্‌কাফের নিকটে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতে অগ্রসর হইল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়গণ এই উপলক্ষে একটি প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইলেন। সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সহিত এক খানি অভিনন্দনপত্র প্রস্তুত হইল। সকলেই একমত হইয়া এই পত্র মুদ্রণস্বাধীনতাদাতার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মেট্‌কাফ্ এই অভিনন্দনপত্র পাইয়া, কোনরূপ আড়ম্বর করিলেন না; তিনি ধীরতা, উদারতা ও যুক্তির সহিত অভিনন্দনপত্রের উত্তর দিলেন। অতিবিস্তৃতিপ্রযুক্ত ঐ উত্তরের সমুদয় অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। আবশ্যকবোধে এক অংশের ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে সম্মত, তাঁহাদের মতের সম্বন্ধে মেট্‌কাফ্ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন :—

"তাঁহারা যদি বলেন; ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞানলাভ করিলে আমাদের রাজত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, পরিণামে যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানবিতরণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্থায়ী অংশ করিতে হইলেই যদি উহার অধিবাসীদিগকে অজ্ঞানাবস্থায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে অভিসম্পাতস্বরূপ হইবে। এরূপ রাজত্বের শেষ হওয়াই উচিত।

"কিন্তু আমি অজ্ঞানাবস্থাতেই অধিকতর ভয়ের কারণ দেখিতে

পাই। ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের রাজত্ব আরও দৃঢ় হইবে, কুসংস্কার দূর হইবে, পরস্পরের শত্রুতা বিনষ্ট হইবে, এবং আমাদের শাসনের উপকারিতা সকলেই বুঝিতে পারিবে। অধিকন্তু ইহাতে ভারতবাসী ও ইংরেজ, সকলেই পরস্পর নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, এবং পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, তাহার হ্রাস হইয়া যাইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ রাজত্বসম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, যত দিন শাসনকার্য্য আমাদের হস্তে ন্যস্ত আছে, তত দিন প্রজালোকের মঙ্গল সাধন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানোন্নতি করাই এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সার অংশ, এবং মুদ্রণ-স্বাধীনতাদানই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সার অংশ সম্পাদনের প্রধান উপায়। কেবল রাজস্ব আদায় করিতে, সেই রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে, এবং যখন অনাটন পড়িবে, তখনই ধার করিতে, ভারতবর্ষে আমাদের থাকা, কখনও জগদীশ্বরের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যসাধনের জন্য এখানে রহিয়াছি। ভারতক্ষেত্রে ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রচার করা এবং তদ্দ্বারা প্রজালোকের অবস্থার উন্নতি করাই এই উচ্চতর কার্য্যের মধ্যে একটি। মুদ্রণস্বাধীনতা থাকিলে যেমন এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে।"

এইরূপ উদার মত পোষণ করিয়া স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ সংবাদপত্রসমুদয়কে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেন। বসন্তকালে এই স্বাধীনতার পক্ষে নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়, এবং শরৎকালে তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকে। মুদ্রণস্বাধীনতা,

১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান দিন, এবং ভারতে ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্টের উচ্চতর কার্য্যসাধনের ইহা একটি প্রধান সাক্ষী। কলি-কাতাবাসিগণ এই প্রধান ঘটনার সাক্ষীভূত প্রধান দিনের কোন স্মরণচিহ্ন স্থাপনের জন্য উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। সংগৃহীত অর্থে ভাগীরথীর তীরে একটি সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত এবং সাধারণের ব্যবহারার্থে উহা একটি পুস্তকালয় করা হইল। মেট্‌কাফের প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি এই পুস্তকালয় শোভিত করিল; "১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর স্যার চার্লস্‌ মেটকাফ্‌ মুদ্রণ-স্বাধীনতা দিয়াছেন," এই মর্ম্মে একখানি ক্ষোদিত লিপি এই সাধারণপুস্তকালয়ে রহিল, এবং মেট্‌কাফের চিরস্মরণীয় নামে এই অট্টালিকার নাম "মেট্‌কাফ্‌ হল" হইল। এক্ষণে এই মেট্‌-কাফ্‌ হলের প্রবেশপথে স্যার চার্লস্‌ মেট্‌কাফের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে, এবং এক্ষণে মেট্‌কাফ্‌ হলের পুস্তক ও পত্রিকারাশি সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসারিত করিয়া, স্যার চার্লস্‌ মেট্‌কাফের কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিতেছে।

এই রূপে বহু বিতর্ক ও বহু চেষ্টার পরে ভারতে মুদ্রণস্বাধী-নতা স্থাপিত হইলে, এই রূপে বহু কাল বহু নিগ্রহ সহ্য করিয়া, সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে লাগিল। এই স্বাধীনতা ব্রিটিশ অধিকারের বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি সমুদয় ভাষায় সমুদয় পুস্তক ও পত্রিকাসম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত হয়। মুদ্রণস্বাধীনতায় আমাদের দেশের অনেক উপকার হইয়াছে। ইহাতে সংবাদপত্রসমূহ ক্রমে পরিপুষ্ট ও উন্নত

হইয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার যে, এত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের যে এত দূর উন্নতি হইতেছে, মুদ্রণস্বাধীনতাই তাহার প্রধানতম কারণ। মুদ্রণস্বাধীনতা না থাকিলে, সংবাদপত্রসমূহকে অনেক সময়ে নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিতে হইত। উহা কখনও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়া সমাজের উপকার করিতে পারিত না।

এই জন্য পরিণামদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই মুদ্রণস্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মান না। ১৮৩৫ অব্দে স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ যে স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন, তাহা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতে থাকে। মধ্যে সিপাহীযুদ্ধের সময়ে লর্ড কানিং কিছুকাল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ রাখেন। সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে—যখন ব্রিটিশশাসনের মূল ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, নরশোণিতস্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল, আতঙ্ক, ভয় সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল—সেই বিঘ্ন বিপত্তির কালে ধীরপ্রকৃতি ও উদারমতি লর্ড কানিং রাজশক্তি নিরাপদ ও রাজনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এক বৎসর কাল সংবাদপত্রসমূহকে একটি বিশেষ আইনের অধীন রাখেন। ইহার পর ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত আর কোন রূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, সংবাদপত্রসমূহকে পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নাই।

১৮৭৮ অব্দে এই চিরবাঞ্ছনীয় মুদ্রণস্বাধীনতার গতিরোধ হয়। এই সময়ে লর্ড লীটন গবর্ণরজেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত অব্দের ১৪ই মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়

এক অধিবেশনে যে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, তাহা ১৮৭৮ অব্দের ৯ আইন নামে প্রসিদ্ধ। জন আডাম যেরূপ ব্রিটিশকোম্পানির অধিকারস্থ বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি সকল ভাষার সংবাদপত্রের জন্যই কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, লর্ড লীটনের প্রবর্ত্তিত ৯ আইন সেরূপ সমুদয় ভাষার উপর আধিপত্য স্থাপন করে নাই। উহা রাজভাষা ইংরেজীকে বাদ দিয়া বাঙ্গালা, হিন্দী, প্রভৃতি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নিয়ামক হইয়াছিল, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহা লিখিত হইত, তাহার উপর এই আইন প্রবর্ত্তিত হইত না; বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষায় যাহা লিখিত হইত, তাহার উপরই এই আইন প্রভুত্ব বিস্তার করিত। এই ৯ আইনের মর্ম্ম এই—

"ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র পুস্তক বা কাগজাদিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, শান্তি নষ্ট করিবার, কিংবা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর কোন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা, দৃশ্য, বা ছবি থাকিলে, যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবে। এতদ্দেশীয় সমস্ত সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) ও প্রকাশককে জেলার মাজিষ্ট্রেট কিংবা রাজধানীর পুলিশকমিশ-নরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, এক এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোন খানিতে রাজভক্তির বিরুদ্ধে অথবা গবর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারিগণের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে, কোন কথা

লেখা হইলে, সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টার) ও প্রকাশক, জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশের কমিশনরের নিকটে যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।"

এই আইন আমাদের উপর একটি গভীর কলঙ্কের আরোপ করিয়াছিল। সুখ ও শান্তির মঙ্গলময় রাজ্যে, সন্তোষ ও সমৃদ্ধির সুখময় শাসনে লর্ড লীটনের গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতবাসীর প্রতি সন্দেহ করিয়া, এই আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন ইহাই বুঝা গিয়াছিল, ভারতবাসী রাজার প্রতি অবিশ্বাসী, এবং ভারতবাসী সাধারণ শান্তির বিরোধী। এক শত বৎসরেরও অধিক কাল, ব্রিটিশশাসনের অসীম প্রতাপের আশ্রয়ে থাকিয়া, এবং ব্রিটিশ সভ্যতার ও ব্রিটিশ নীতির নিকটে মস্তক অবনত রাখিয়া, ভারতবর্ষ রাজভক্তিশূন্য বলিয়া কলঙ্কিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ রাজার প্রতি অবিশ্বাসী বলিয়া দূষিত হইয়াছিল, হায়! ভারতবর্ষ সাধারণের নিকটে আপনার রাজভক্তি সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। যে জাতির আদিকাব্য রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, যে জাতির জ্ঞানকাণ্ড শান্তির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, যে জাতি পিণ্ডারীযুদ্ধের সময়ে উপাস্য দেবতার নিকটে ভক্তিভাবে যোঁড় করে ব্রিটিশ রাজের বিজয়প্রার্থনা করিয়াছে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ে তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়াছে, ডিউক্ অব্ এডেনবরা এবং প্রিন্স অব্ ওয়েলসের শুভাগমনে ভক্তির একশেষ দেখাইয়াছে, এবং সে দিন মহারাণী বিক্টোরিয়ার 'ভারতের অধীশ্বরী' উপাধিগ্রহণসময়ে একই উৎসব,

একই আহ্লাদের স্রোতে হিমালয় হইতে কুমারিকা, হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সমস্তই ভাসাইয়া দিয়াছে, সেই জাতি রাজভক্তিশূন্য, সেই জাতি রাজার প্রতি অবিশ্বাসী! সে জাতি "নাড়িলেও নড়ে না, শত আঘাতেও বেদনা বোধ করে না, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই স্পন্দিত হয় না," সেই জাতি সাধারণ শান্তির বিরোধী! হা জগদীশ্বর! ইহা অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদ আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অনুচিত কলঙ্ক আর কি সম্ভবে? কে ভাবিয়াছিল, "ভারতের দুঃখদগ্ধ হৃদয়ে" সহসা এমন অভূতপূর্ব্ব তীব্র কুঠারাঘাত হইবে? কে ভাবিয়াছিল, এই গুণগ্রাহী সুসভ্য যুগে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে পাপ ও কলঙ্কের মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিবে?

কিন্তু এই অযোগ্য আইনের জন্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল মর্ম্মপীড়ায় কাতর থাকিতে হয় নাই, দীর্ঘকাল ভারতের হৃদয়ে নিদারুণ তুষানল গতি প্রসারিত করে নাই। লর্ড লীটনের পর মহামতি লর্ড রিপণ গবর্ণরজেনেরলের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার উদারনীতির গুণে এই আইন উঠিয়া যায়। ভারতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় মুদ্রণস্বাধীনতা স্থাপিত হয়।

পরিশিষ্ট।

লর্ড লীটনের প্রবর্ত্তিত মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ষ্টেটসেক্রেটরির মন্ত্রিসভার তদানীন্তন সদস্য স্যার এরস্কিন পেরি স্যার উইলিয়ম মুইর, কর্ণেল ইয়ুল, মাদ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য স্যার আর্থর হবহাউস, (লর্ড হবহাউস্) যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

স্যার এরস্কিন্ পেরির মতের সারাংশ।

এরস্কিন্ পেরি মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সাতিশয় অবনতির চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, "আমরা পঞ্চাশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে যে উদার নীতি অনুসারে চলিয়া আসিয়াছি, এই ব্যবস্থা সেই নীতির এত বিরোধী এবং ইহা জাতিগত পার্থক্য দেখাইয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্ভবতঃ এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে, এই ব্যবস্থা আমাদের আইনের পুস্তক হইতে একবারে তুলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

পেরি সাহেব ইহার পর কহিয়াছেন—"ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যই গত ১৪ই মার্চ্চ এমন কোন বিপদ দেখিতে পান নাই, যাহাতে এই আইন সভার এক অধিবেশনে এত তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ হইতে পারে। ১৮ মাসকাল, ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সমূহে যাহা যাহা বাহির হইয়াছে, তাহারাই কোন কোন অংশের অনুবাদ দেখিয়া, এই আইন করা হইয়াছে। এই সকল অংশের

বিদ্রোহসূচক ভাবে বিপদের আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সংবাদপত্র কোনরূপ আকস্মিক বিপদ ঘোষণা করে নাই। এমন একটি গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, ব্যবস্থাপক সভার যে সমস্ত দস্য গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী নহেন, তাঁহাদিগকে সমুদয় বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ ১৮৭৪ অব্দে লর্ড সালিস্‌বারি যে অভিপ্রায় (ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে ভারতের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ হোম গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইবে) প্রকাশ করেন, সেই অভিপ্রায় অনুসারেও কাজ করা উচিত ছিল। যেহেতু, মুদ্রণশাসনসংক্রান্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী অপেক্ষা ইউরোপের শাসনপ্রণালীর সহিত অধিকতর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং রাজপুরুষদিগের কার্য্যকলাপের স্বাধীনভাবে সমালোচনার প্রতিষেধ সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম করা উচিত কি না, অপক্ষপাতে তাহার বিচার করিতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষা ইণ্ডিয়া কৌন্সিলই অধিকতর সমর্থ।

"যে দুই জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ইংলণ্ডে রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ডিউক অব্‌ বাকিংহোম এবং স্যার আর্থার হবহাউস্‌ উপস্থিত আইনের অনুমোদন করেন নাই।

"১৪ই মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ষোল জন মেম্বর উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বার জন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী, এবং এক জন মাত্র ভারতবর্ষীয় ছিলেন, সুতরাং সেই সদস্যগণের সম্মতির কোনও গুরুত্ব নাই।

"ফ্রান্সের দুই নেপোলিয়ান সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে আইন প্রচার করেন, এবং ১৮৮০ অব্দে আয়র্লণ্ডে যে আইন প্রচারিত হয়, তাহার সহিত উপস্থিত আইনের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আয়র্লণ্ডের আইন অল্প দিনের জন্যই জারি হইয়াছিল, ১৮৭৪ অব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই ভারতবর্ষীয় আইনে আয়র্লণ্ডের আইনের ন্যায় এমন কোন বিধি নাই, যদ্দ্বারা কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংবাদপত্রের উচ্ছেদের জন্য এই আইনের ন্যায় আর কোন দেশে কোনও আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

"যখন বর্ত্তমান সময়ে কোনরূপ আশঙ্কা নাই, তখন ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর কাল যে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠাইয়া দিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। ভারতবর্ষে মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপনের ন্যায় আর কোন বিষয়ই প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞকর্ত্তৃক বহু বিবেচনার পর স্থিরীকৃত হয় নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে যে সমুদয় যুক্তি দেখান হইয়াছে, ১৮৩৫ অব্দেও তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সেই সকল যুক্তি উপেক্ষিত হয়।

"মুদ্রণস্বাধীনতা দেওয়াতে এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে অপকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উপকার হইয়াছে। যে আশঙ্কা করিয়া বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ১৮৩৫ অব্দেও সেই আশঙ্কা করা হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে সংবাদপত্র হইতে যদি কোন বিপদের আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলে স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ ও লর্ড মেকলে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই

নির্দ্দেশ করিতেছি। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে লর্ড কানিঙ্ও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য একটি স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করা আমার সম্পূর্ণ অমত।

"লর্ড লীটনের উপর আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহা দ্বারা যে, কোন রূপ অযথা অত্যাচার হইবে, তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু তাঁহার পরে কে গবর্ণরজেনেরল হইবেন, বলিতে পারি না। কোন গবর্ণরজেনেরল কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে, তিনি কি করিতে পারেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি। এক সময় এক জন গবর্ণরজেনেরল কোন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য এক জন মুদ্রাকর ও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর তিন মাস কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। এই সংবাদপত্র 'মর্ণিংক্রনিকল্', এবং ইহার সম্পাদক, আমার পিতা।

"এই আইন কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের অসন্তোষজনক নহে, আমরা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভারতবর্ষের বিষয়ে যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন সংবাদপত্র হইতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

"আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান নিয়মানুরক্ত জাতিকে শাসন করিতেছি, তথাপি নিত্য নিত্য নূতন নূতন আইন করিয়া তাহাদিগকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিতেছি না।"

স্যার উইলিয়ম মুইরের মতের সারাংশ।

ষ্টেট সেক্রেটরি ৯ আইনের অনুমোদন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, স্যার উইলিয়ম মুইর তাঁহার সহিত একমত হয়েন নাই। মুইর সাহেব কহেন, "১৮৫৭ সালের স্থায় কোন ঘোরতর বিপদের সময়ে কিছু কালের জন্য এইরূপ আইন জারি করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষকে কখন এমন শান্ত ও সুনিয়মিত দেখা যায় নাই; নূতন নূতন করভার বহন করিয়াও, ভারতবর্ষ কখন এমন বশবর্ত্তী রহে নাই। মধ্যএশিয়াসংক্রান্ত আন্দোলনে ভারতবর্ষ রুষিয়ার প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছে। কাবুলের আমীরের প্রতি আমাদের অন্যায়াচরণেও ভারতবর্ষ আমীরের সহিত সমবেদনা দেখায় নাই। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। নির্ম্মল ও মেঘশূন্য আকাশ হইতে সংবাদপত্রের উপর অকস্মাৎ বজ্র পতিত হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।"

মুইর সাহেবের মতে সংবাদপত্র হইতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করা অনেক দূরের কথা। তিনি কহেন, "স্যার আস্‌লি ইডেন প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান রাজপুরুষ ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। যে সকল

*কল্‌বিন সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তদ্দেশীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কহেন :— "এ প্রদেশের (উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের) ন্যায় কোথাও সংবাদপত্র এত স্বাধীনভাব গ্রহণ করে নাই। কোন কোন পত্র বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য, পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য উৎপাদন জন্য, এবং জনসাধারণকে আক্রমণ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহা-

সংবাদপত্র অন্যায়রূপে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখায়, সমাজে যদি তাহাদের ক্ষমতা বা সম্মান না থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশঙ্কা করিয়া চল্লিশ বৎসরের পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন কি ?"

দের এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ এ প্রদেশে সংবাদপত্রপাঠকের সংখ্যা আজও অতি অল্প রহিয়াছে।"

স্যার উইলিয়ম মুইর এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন :—"আমি যখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলাম, তখন ঐ সকল সংবাদপত্র পড়িয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার সহিত এই মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখা যায়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী ইহার সাক্ষী। আমি ১৮৭১ সালের বিজ্ঞাপনীর এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—'এই সকল সংবাদপত্র পড়িয়া যে পরিমাণে লোকের মানসিক উন্নতি হইতেছে, তাহা কম নহে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের একটি নিয়ম এই যে, উহারা সুরুচির বিরুদ্ধে কিছুই লিখে না, এবং নূতনই হউক কি ইংরেজী কাগজ হইতেই গৃহীত হউক, ঐ সকল কাগজের অধিকাংশ বিষয়ই পাঠকদিগের উন্নতি ও অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করে।"

১৮৭৩ অব্দের বিজ্ঞাপনী—"ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের লিপিপ্রণালী সুন্দর ও রাজভক্তিপ্রদর্শক। প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশেষে ঐ সংবাদপত্রের অভিমত সাধারণের মত বলিয়া গণ্য হইবে।"

"১৮৭৫ সালে প্রকাশিত স্যার জন্ ষ্ট্রাচির সঙ্কলিত ১৮৭৩-৭৪ সালের বিজ্ঞাপনীতে সংবাদপত্রের অনুকূলে আমরা এই প্রমাণ পাইতেছি :—'সাধারণতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র দ্বারা অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আপনাদের ত্রুটি এবং দোষ সংশোধন করিতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা স্যার উইলিয়ম মুইর স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের তদ্দেশীয় সংবাদপত্রসকল রাজভক্তি ও সুনীতির পক্ষপাতী। ইহার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীসমূহেও সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ অনুকূল মতের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সংবাদপত্র হইতে আমি ৬ বৎসরকাল অনেক সাহায্য পাইয়াছি। নূতন প্রণালী অনুসারে এই সাহায্যের আশা বৃথা। বদ্ধমুখ সংবাদপত্র কখনও পরিস্ফুটরূপে সত্য কথা কহিতে পারে না।"

"সংবাদপত্র কখন কখন অন্যায় ক্ষমতা লইতে চায়, অসত্যকে সত্য বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে। ইহার নিবারণ জন্য জামিন লওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সরঞ্জম জব্দ করা, ও মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ করার ক্ষমতা কখনও স্বেচ্ছাচারী মাজিষ্ট্রেটের হস্তে রাখা উচিত নহে। এ ক্ষমতা স্বাধীন বিচারকের হাতেই রাখা বিধেয়। গবর্ণমেণ্টের নিজের বিষয়ে নিজেরই বিচারক হওয়ার কোন হেতু দেখা যায় না।

"জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা, সর্ব্বজনগ্রাহ্য যুক্তিসঙ্গত মত প্রচার করা, প্রজাদিগকে অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে লিপ্ত করা এবং তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আত্মশাসনক্ষম করা, যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন মুদ্রণস্বাধীনতা রাখা, কেবল প্রজালোকের উপকারের জন্য নয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ উপকারের জন্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া, সেই বহুমূল্য সহায়তা এবং জাতীয় উন্নতির সেই প্রধান উপায় নষ্ট করিয়াছেন।

"উপস্থিত আইন ইংরেজী সংবাদপত্র সমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সমুদয়কেই নিগড়বদ্ধ করিয়াছে। ইহা, ব্রিটিশশাসনপ্রণালী যে পক্ষপাতে দূষিত, এই পুরাতন জনপ্রবাদেরই পরিপোষণ করিবে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে যদি কোন আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন আইন করা বিধেয়। ব্যবস্থাপকসভার কাগজপত্রে যেমন দেখা যায়, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহ লোকের নিকটে, আদরণীয় নহে। কেহ উহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে না। কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্র জনসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাসযোগ্য। এই সকল কাগজে যদি কোন

বিষয়ে অসাবধানতা দেখা যায়, তাহা হইলে দ্বিগুণ বিপদ ঘটিতে পারে। সমুদয় ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র অপেক্ষা এক খানি ইংরেজী সংবাদপত্রের অসাবধান লেখা ভারতবর্ষীয় মিত্র রাজগণের অধিকারে ও সীমাস্থিত প্রদেশে অধিকতর সন্দেহ, অধিকতর বিদ্বেষ ও অধিকতর ঘৃণা জন্মাইতে পারে, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকতর ক্ষতি করিতে পারে।"

মুইর স্বকীয় মন্তব্যলিপির এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন ঃ—"এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষার বহুল পরিমাণে প্রচার হইতেছে। স্বল্প-বিদ্য লোকে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র পড়িয়া যে অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, যাহারা অল্প মাত্রায় ইংরেজী লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িয়াও সেই অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারে। তবে কি অনিষ্টের নিবারণ জন্য ইংরেজী শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করা বিধেয়? ইহার উত্তরস্থলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ নীতি নয়। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া এক হাতে আলোক বিস্তার করিবেন, এবং আর এক হাতে সেই আলোকের পথ রুদ্ধ করিবেন? যখন রাজ-নৈতিক আন্দোলনে ইংরেজী ভাষা কথিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যাহা করা আবশ্যক, ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও তাহাই করা আবশ্যক।

"মধ্যএশিয়ার শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের সহিত যে যে ব্যক্তির কথোপকথন হয়, তাঁহাদের এক জনের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে মুদ্রণস্বাধীনতা থাকাতে, মধ্যএশিয়ার শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যে, প্রজালোককে বিশ্বাস করেন, স্বাধীন সংবাদপত্রই

তাহার একটি প্রধান প্রমাণ। যে সময়ে অপক্ষপাত নীতি ও প্রজালোকের উপর বিশ্বাস, আমাদের গৌরবের কারণ হইতেছিল, সেই সময়ে আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমাদের রাজনীতি ঘৃণিত ও প্রজালোকের উপর আমাদের বিশ্বাস নষ্ট করিলাম, এবং যে সময়ে আমরা মধ্যএশিয়ায় মহারাণীর প্রাধান্য রক্ষার জন্য আমাদের নিজের সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সৈন্য এক শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়া, রাজভক্তির সম্মান করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমরা মধ্যএশিয়ার যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিলাম।”

কর্ণেল ইয়ুলের মতের সারাংশ।

কর্ণেল ইয়ুল মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, কোন বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন সামরিক আইনকে সেনাপতির ইচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উপস্থিত আইনও সেইরূপ গবর্ণরজেনেরলের ইচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। গবর্ণরজেনেরল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, “এই আইনের উদ্দেশ্য শাস্তিপ্রদান নহে, অনিষ্টের নিবারণ।” গবর্ণরজেনেরলের এই মতানুসারে ফাঁসি দেওয়াও কেবল অনিষ্টের নিবারণ জন্য হইয়া থাকে, শাস্তিপ্রদানের জন্য নয়।

ইয়ুল কহেন, রাজ্যশাসনের রীতি দ্বিবিধ, ওলন্দাজী ও ইংরেজী। ওলন্দাজী রীতিতে প্রজাদের কোন রূপ উন্নতি হয় না। কেবল অর্থোপার্জ্জনই এই রীতির প্রধান লক্ষ্য। এক্ষণে আর ওলান্দাজী রীতি অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিবার সময়

নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজী রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার ওলন্দাজী রীতি আনিয়া ফেলিলে বিপদ ঘটিতে পারে।

ডিউক অব্ বাকিংহাম্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহের একমাত্র দোষ এই যে, তৎসমুদয় আমাদের ত্রুটি কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে। ইয়ুল ইহাতে কহিয়াছেন, "আমরা ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র হইতেই আমাদের ত্রুটি জানিতে পারি। সুতরাং তৎসমুদয়ের মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য নয়। অধিকন্তু ব্যবস্থাপকসভায় তর্কবিতর্ক সময়ে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয় যে, পার্লেমেণ্ট ও স্বাধীন সংবাদপত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ; ইহাদের উভয়ই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, যে দেশে পার্লেমেণ্ট নাই, সেই দেশের স্বাধীন সংবাদপত্র দ্বারাই পার্লেমেণ্টের কার্য্য হইয়া থাকে।"

সংবাদপত্রের কোন্ লেখা দূষণীয়, এবং কোন্ লেখা নির্দ্দোষ, কর্ণেল ইয়ুলের মতে তাহার মীমাংসা স্বাধীন বিচারক দ্বারা হওয়া উচিত। মাজিষ্ট্রেটের হস্তে উহার মীমাংসার ভার রাখা বিধেয় নহে। যদি বর্ত্তমান আইন এই মীমাংসায় সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সেই আইনের সংশোধন আবশ্যক। অন্য একটি নূতন আইনের আবশ্যকতা নাই।

"যে ভাবে এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিরতিশয় বিস্ময়জনক। এরূপ গুরুতর বিষয়ে কেহ কোন রূপ আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যে নীতি চলিয়া আসিয়াছে, সকলেই একমত হইয়া, অসঙ্কুচিতভাবে তাহার উচ্ছেদ করিয়াছেন।

"আইনের প্রস্তাবকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে যদি বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে গুরুতর আন্দোলনে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে পারে, গবর্ণরজেনেরল স্বকীয় মন্তব্যলিপিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তুরস্কে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে বাজারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু গবর্ণরজেনেরল ষ্টেট সেক্রেটরিকে এই ভাবে টেলিগ্রাম করেন যে, তাঁহাকে ১৮ই মার্চ্চ সিমলায় যাইতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে আইনটি বিধিবদ্ধ না করিলে, এ বৎসর আর উহা বিধিবদ্ধ হইবে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনেই এই আইন জারি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার পর এ বিষয়ের সমস্ত বিবরণ জানান যাইবে।"

এই কয়েকটি কারণে বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হয়। কর্ণেল ইয়ুল এ স্থলে কহিয়াছেন, "যে বিষয় আজ দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে, সেই গুরুতর বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটরিকে ধীরভাবে বিচার করিতে না দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।"

ইয়ুল স্থলান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যখন গবর্ণরজেনেরলের মন্তব্যলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন হব্‌হাউসের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যলিপি পাঠান হয় নাই, যেহেতু উহা উপস্থিত আইনের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে লোকের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণের উত্তেজনার নিবারণ করিতে প্রয়াস পান নাই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের নিবারণ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন।"

ডিউক্ অব্ বাকিংহামের মতের সারাংশ।

গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহের শাসনসম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, মাদ্রাজের গবর্ণর ডিউক্ অব্ বাকিংহাম তদ্বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"গবর্ণরজেনেরলের মন্তব্যলিপির সঙ্গে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের অংশবিশেষের অনুবাদ আছে। এই সকল অংশের কোন কোনটি বিদ্বেষভাবের পরিচয় দিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি অসন্তোষকর সত্য কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।

"কিছু টাকা জামানতি রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আমার মতে অধিক টাকার জামিন না লইলে কোনও ফলের সম্ভাবনা নাই। আবার যদি জামানতি টাকা অধিক অর্থাৎ অন্যূন ২,০০০ পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে উহা নিরীহ সংবাদপত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে গুরুতর হইবে। পক্ষান্তরে উহা দ্বারা বিপদের নিবারণও হইবে না। যেহেতু যাহারা সংবাদপত্রে নিয়ত বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করে, তাহারা আপনাদের অভ্যস্ত রীতি অনুসারে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে।

"বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদানের সমস্ত ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, স্বাধীন বিচারকের হাতে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এক মাজিষ্ট্রেট যাহা করিবেন, সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে তাহাতেই অবনতমস্তক হইতে হইবে। এরূপ নিয়ম আমার সম্পূর্ণ অননুমোদিত।

"উপস্থিত আইনে প্রকাশ পাইতেছে যে, ইংরেজী সংবাদ-পত্রে যে সমস্ত বিদ্বেষজনক কথা থাকিবে, তাহার জন্য সেই

সংবাদপত্র দণ্ডার্হ হইবে না, কিন্তু সেই কথা ভারতবর্ষীয় সংবাদ-পত্রে বাহির হইলে ঐ সংবাদপত্র দণ্ডার্হ হইবে। ইংরেজী ও ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য বিধান করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, আমরা ইংরেজদিগের জন্য এক আইন করি, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য আর এক আইন করিয়া থাকি। আমার বিবেচনায় এরূপ পার্থক্য রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা অব্যাহত রাখিয়া কার্য্য করা অসাধ্য।

"গবর্ণরজেনেরলের মন্তব্যে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, কেবল ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহই গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে লর্ড কানিঙ্ কিছু কালের জন্য মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার প্রচার করিয়া, প্রথমেই ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন কেন ?

"ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র ভারতবর্ষীয় প্রজালোকের মনের ভাব প্রকাশ করে। গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজালোকের বিদ্বেষ বা শত্রুতা জন্মিলে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহেই তাহার নিদর্শন লক্ষিত হইবে। যে সকল সংবাদপত্র এইরূপ বিদ্বেষভাবের উত্তেজনা করে, প্রচলিত দণ্ডবিধি দ্বারাই তৎসমুদয়ের শাস্তি বিধান হইতে পারে।

"ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করা অথবা তাহার অযথা নিন্দা করা, আমার বিবেচনায় মুদ্রণস্বাধীনতার অপ-ব্যবহারের অপকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাতে কেবল উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর মূল নষ্ট হয় না, সমাজেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রচলিত আইন দ্বারা এই অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে।

আমার বিশ্বাস, অনিষ্টের নিবারণ জন্য এই উপায়ের অবলম্বনই প্রকৃত রাজনীতি।”

স্যার আর্থার হব্‌হাউসের মতের সারাংশ।

স্যার আর্থার হব্‌হাউস (এক্ষণে লর্ড হব্‌হাউস্) মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মতে কোন সংবাদপত্রে বিদ্রোহসূচক ভাব লক্ষিত হইলে তাহা দণ্ডবিধির শাসনাধীন করাই কর্ত্তব্য। উপস্থিত সময়ে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন করিবার প্রয়োজন নাই।

হব্‌হাউস কহেন, মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিলে ভারতবর্ষীয়গণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট্‌ বিল প্রভৃতি ইহার প্রমাণ।

হব্‌হাউসের মতে ইংরেজী ও ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রাখা উচিত নয়। ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—“সূক্ষ্মরূপে দেখিলে জানা যাইবে যে, আমাদের দেশীয়গণই গবর্ণমেণ্টের অধিক নিন্দা করিয়া থাকেন। ষ্টেটস্‌ম্যানের যে সমস্ত প্রবন্ধ ‘ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়ায়’ প্রকাশিত হয়, তাহার কোন কোনটিতে আমাদের প্রতি এই দোষ দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতেছি; এই অপরাধের জন্য আমরা ঈশ্বর ও মানবের কোপানলে পতিত হইব। সংবাদপত্রে কোনরূপ লেখাতে যদি বিদ্রোহবুদ্ধির উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে এরূপ লেখাতে নিশ্চয়ই তাহা হইবে। এক্ষণে যদি ইংরেজী সংবাদপত্রের এইরূপ দূষণীয় প্রবন্ধ দণ্ডার্হ না হয়, তাহা হইলে সেই প্রবন্ধ কোন

ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রে অনূদিত হইলে কেন দণ্ডার্হ হইবে? এক ভাষায় কোন ভাব ব্যক্ত করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে, অন্য ভাষায় উহা ব্যক্ত করিলে সেই আশঙ্কা নাই, আমার বিশ্বাস এরূপ নয়।

"ভারতবর্ষীয় ভাষায় সংবাদপত্র যে সকল বিষয় কঠোরভাবে আন্দোলন করে, তৎসমুদয় এই,—ইউরোপীয়দিগের অনুচিত অধিকার; এক অপরাধে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অপরাধীদিগের দণ্ডের প্রভেদ; ইউরোপীয়দিগের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহার; ইংরেজী সংবাদপত্রের বিদ্বেষভাব; এবং ভারতবর্ষীয় রাজদরবারে রেসিডেণ্টদিগের অনিষ্টজনক অসদ্ব্যবহার।

"উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজ ও এতদ্দেশীয়তে কোন প্রভেদ নাই। কেন না উভয়েরই উদ্দেশ্য, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে থাকে। বিশেষতঃ এতদ্দেশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীই অধিকপরিমাণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব কামনা করে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র যে, বিদ্রোহের উত্তেজনা করে, সংবাদপত্রের লেখাতে যে, লোকের মন বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইংরেজী সংবাদপত্রের উগ্র ও বিরক্তিকর লেখা যদি বিদ্বেষের প্রমাণ না হয়, তবে তাহার ছন্দানুবর্ত্তী ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের লেখা প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে কেন?

"ইংরেজী ও ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রে জাতিগত পার্থক্য আছে। গবর্ণমেণ্ট সজাতির প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ইংরেজী সংবাদপত্রকে ইহা লিখিতে হয় না, যেহেতু তাহারা জেতৃজাতীয়। কিন্তু সচরাচর যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহা না করিয়া তুল্যভাবে ও ন্যায়ানুসারে উভয় জাতির বিচার করিতে উদ্যত

হও, দেখিতে পাইবে, কি ঘটনা উপস্থিত হয়। এই ঘটনার সহিত তুলনা করিলে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের চীৎকার মৃদু ধ্বনি বলিয়া বোধ হইবে। মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমায় কোন ইংরেজী সংবাদপত্র অথবা ইংরেজবক্তা বলিয়াছিলেন যে, মিয়ার্সকে দণ্ড দিলে কলিকাতার সমুদয় ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। যশোহরের মাজিষ্ট্রেট, বিচারপতি ফিয়ার এবং প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড কৌচকে সমুদয় ইংরেজী পত্র কেমন কঠোর ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল, এবং হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখিলে গবর্ণমেণ্টের কত বিপদ ঘটিবে বলিয়াই বা ভয় দেখাইয়াছিল। ফুলার সাহেবের মোকদ্দমার মন্তব্যলিপির প্রসঙ্গেও সেই প্রচণ্ডভাব পূর্ব্বাপেক্ষা একটু মৃদু ভাবে বিকাশ পায়। ইংরেজী সংবাদপত্রের মতে আমাদের কার্য্য আইনবহির্ভূত, দৌরাত্ম্যজনক এবং নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রকাশক; উহা কেবল অজ্ঞতা ও দুরভিসন্ধিতে উৎপন্ন হয়।

"আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সংবাদপত্র অনেক পরিমাণে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের তুল্য অপরাধে পৃথক দণ্ডের উল্লেখ করে; ফুলারের মোকদ্দমার মন্তব্যলিপিতে আমরা ঠিক তাহাই বলিয়াছি। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে উচ্চপদপ্রদানের জন্য বিরক্ত হয়; এই ক্রটি দূর করিতে পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক আইন প্রণীত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও এই ক্রটিপরিহারের উপায়নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা ইউরোপীয়দিগের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করে; অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় এ কথা স্বীকার করেন। রেসিডেণ্টগণ

অসদ্ব্যবহার করেন, অথবা টাকা কর্জ্জ করেন কি না, তাহা আমি জানি না। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে সাধারণকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত।

"জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন ও মুদ্রণস্বাধীনতা দান করিলে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াই থাকে। আমরা উদার নীতি অনুসারে এই দুই বিষয়েই উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। কিছু বাড়াবাড়ি দেখিলেই আমাদের ভীত হওয়া উচিত নহে। অধিক শিক্ষা পাইলে যদি ক্ষমতা না বাড়ে, তাহা হইলে লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াই থাকে, এবং সেই ক্ষমতা পাইবার জন্যে অধীর হয়। এই রূপে বাগ্‌যন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে লোকে না বুঝিয়া, দুই একটি কথা বলিয়া ফেলে। ভারতবর্ষের প্রজালোককে সুশিক্ষিত ও সজীব করিলে আমাদের যে উপকার হয়, এই সকল ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। আমরা উহা এড়াইতে পারিব না। আমার বিশ্বাস, সাধুতাসহকারেও অটলভাবে রাজ্য শাসন করিলে সংবাদপত্রের অন্যায় ও অকারণ দোষারোপে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।"

সম্পূর্ণ।